ঋষি রবীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬১

মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬০ সালের ২৩শে শ্রাবণ হইতে ২৩শে আশ্বিন ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬১ সাল

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস আজ জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি পরিচয়ই প্রাধান্য লইয়া উত্তরোত্তর পুরোভাগে আগমন করিতেছে, সে-পরিচয়টি হইল—রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে উপনিষদের ঋষি। ঋষি শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করিয়া থাকে. ঋষি অর্থে সত্যদ্রষ্টাকে বুঝাইয়া থাকে। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন. তিনিই ঋষি। রবীন্দ্রনাথকে এই অর্থেই ঋষি বলা হইয়া থাকে।

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ কি ব্রহ্মজ্ঞ? প্রশ্নটি জিজ্ঞাসার মধ্যে কোন অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রতিবাদ ইত্যাদি সূচিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া, গান শুনিয়া সকলের মনেই এই ধারণা হইয়া থাকে যে, তিনি সত্য-দ্রষ্টা ঋষি এবং তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস তো প্রমাণ নহে. তাই তাঁহাদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে কোন প্রমাণ আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যই উক্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান. গল্প, উপন্যাস, নাটক. প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের মতবাদ. রবীন্দ্রনাথের রচনা ইত্যাদির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, ইহা প্রমাণের চেষ্টা উভয়ের কেহই করেন নাই. ঋষিরূপে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা

রবীন্দ্রদর্শন ও বাণীরই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও অনেকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রহিয়াছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই বিশেষভাবে এই প্রশ্নটিকে গ্রহণ করিয়া ইহার মীমাংসার চেষ্টা করা হয় নাই। রবীন্দ্র-জীবনীও কয়েকখানা রহিয়াছে, তাহাতেও পূর্বোক্ত প্রশ্নের কোন আলোচনা পরিদৃষ্ট হয় না।

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি বস্তুতই কঠিন প্রশ্ন। কেহ ব্রহ্মজ্ঞ কি না, এ-প্রমাণ কে দিবে? তাহা ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞ প্রমাণ-নির্ভর, এমন কথাও বলা চলে না। ব্রহ্ম আছেন, ইহাই কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না, কারণ ব্রহ্ম প্রমাণের অতীত। যাঁহাকে প্রমাণ করা যায় না, সেই ব্রহ্মকে কেহ জানিয়াছেন কি না, ইহাও প্রমাণ করা স্বভাবতই সমান সাধ্যাতীত। সাধকগণ বড়জোর এই কথাই বলিতে পারেন এবং বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মকে জানা যায়, তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মোপলব্ধিই এই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ।

কিন্তু সে-প্রমাণও একান্তভাবে তাঁহাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই আবদ্ধ, তাঁহারাও সে-প্রমাণকে বাহিরে আনিতে পারেন নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ঋষি, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ইহা প্রমাণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। শুধু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই জানিতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ কি না। কিন্তু তাঁহাদের সে-জানাটাও প্রমাণ করা অসাধ্য ও অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, আমাদের এই বিশ্বাসের তবে কি কোন প্রমাণই পাওয়া সম্ভবপর নহে? সে-প্রমাণ পাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি না। কেন, তাহাই প্রথমে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের পরিচয়ে বলা হইয়াছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", এই অচিন্ত্য বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহা হইতে, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। কিন্তু ইহা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ নহে, শুধু লক্ষণ বা চিহ্ন। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ সম্বন্ধেও লক্ষণ বা চিহ্ন থাকে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞের সে লক্ষণ বা চিহ্ন কি? ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিই সেই লক্ষণ। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, যখন নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের বাক্য মিলিয়া যায়, তখনই সাধক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য এই সঙ্কেতনির্দেশ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত সেই প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি

অল্প কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার আত্মজীবনীর পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, নিজের জীবনস্মৃতি রচনাতে তিনি নিজেকেই যথাসাধ্য আড়ালে রাখিয়াছেন, শুধু জীবনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে বলিতে তাঁহার ভদ্রমন এতই সংকোচ ও দ্বিধাবোধ করিয়াছে যে, নিজের জীবনের ঘটনারও খুব কম উল্লেখই তিনি আপন জীবনস্মৃতিতে করিয়াছেন। সংযত ভদ্রমনের এতবড় পরিচয় আজ পর্যন্ত কোন আত্মজীবনীতেই দেখা যায় না এবং মনের এইরূপ আভিজাত্য লইয়া কম মানুষই পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা লইয়া রবীন্দ্রনাথ আসেন নাই, আসিয়াছেন কবিরূপে, তাই আপন জীবনের এই গভীরতম দিকটি তিনি নিকটতম জনের নিকট হইতেও একান্তভাবে গোপন রাখিয়াছেন। তথাপি শ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া অগ্রসর হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ যে না করা যায়, এমন নহে। কোন অধিকারী পুরুষ যদি এই বিষয়ে অগ্রসর হন, তবে রবীন্দ্রনাথের ঋষি-জীবনী এক পরম সম্পদরূপেই তিনি দেশবাসীকে দিয়া যাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ঋষি-জীবনের সামান্য একটু দিগ্দর্শনের চেষ্টা মাত্র এখানে করা যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্নটিই প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে—ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকার ছিল কিনা। শাস্ত্র এবং আচার্যগণ বলেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মবিদ্যার জন্য বিশেষ অধিকার আবশ্যক করে। কি সে বিশেষ অধিকার?

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রটির ভাষ্যেই আচার্য শঙ্কর এই অধিকারী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অধিকার-বিচারে তিনি বলিয়াছেন — নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, ষট-সম্পত্তি (শম = বহিরিন্দ্রিয় সংযম, দম = অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা = শীতোষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, উপরতি = বিষয়ানুভব হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি, সমাধান = আত্মতত্ত্বের ধ্যান এবং শ্রদ্ধা = গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সম্যক্ শ্রদ্ধা) এবং মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষের নিমিত্ত তীব্র ইচ্ছা) এই সকল যাঁহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই শুধু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী।

কোনরূপ বিশ্লেষণ না করিয়াই বলা চলে যে, আচার্য শঙ্করের নির্দিষ্ট এই অধিকার-বিচারে রবীন্দ্রনাথ কদাচ অধিকারী পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্-সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব বহু ও দীর্ঘ সাধনার পরেই সাধকের প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু বা দীর্ঘ কোন সাধনাতে [illegible]নাথ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর অধিকারসমূহ অর্জন করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। কাজেই, আচার্য শঙ্করের বিচারে রবীন্দ্রনাথ অধিকারী পুরুষ নহেন, ইহাই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এমন পুরুষের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রবীন্দ্রনাথ সেই বিরল পুরুষদেরই অন্যতম, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইবে, তাহার প্রমাণ কি? সেই প্রমাণই অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে। সে-প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেই পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের যখন পৈতা হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো কি বারো হইবে। পৈতার পরে একদিনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া জল পড়িতে লাগিল।" বলা বাহুল্য, ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ও তত্ত্ব উপলব্ধির বয়স বা অবস্থা সেটা নহে, মনীষা এবং প্রতিভা তাঁহার যত প্রচুরই হউক না কেন। রবীন্দ্রনাথ তাই ঘটনাটির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন, "মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে।"

ইহা গেল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা অনুমান। এখন দেখা যাক্ যে, এই উপলব্ধিটিকে বা ঘটনাটিকে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে কি পাওয়া যায়।

'যোগসূত্র' নামক পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য পাদে একটি সূত্র রহিয়াছে, "বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তি॥" সূত্রটির সরল অর্থ—"চিত্ত হইতে আত্মাকে যিনি পৃথকরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আর আত্মভাবনা কিছু থাকে না।" ভগবান বেদব্যাস এই সূত্রটির ভাষ্য করিয়াছেন—"যেমন বর্ষাকালে তৃণাঙ্কুরের উদ্গম দেখিয়া তাহার বীজ মৃত্তিকায় থাকা প্রমাণ হয়, তদ্রূপ মোক্ষ-মার্গের বিবরণ শ্রবণে যে ব্যক্তির শরীরের রোমাঞ্চিত হইতে ও অশ্রুপতন হইতে দেখা যায়, তাঁহাতে আত্মসাক্ষাৎকারের বীজ বর্তমান আছে এবং তাঁহার মোক্ষোৎপাদক কর্মসকল ফলোন্মুখ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায় : আত্ম-বিষয়ে ভাবনা তাঁহার স্বভাবতঃই প্রবর্তিত হয়॥"

যোগদর্শন এবং ভগবান বেদব্যাসের কথিত লক্ষণটি এই ক্ষেত্রে অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, এগারো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রী-জপে অশ্রু-পতনের অর্থ হইল—আত্ম বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বীজটি লইযাই রবীন্দ্রনাথ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মোক্ষোৎপাদক কর্মসকল ফলোন্মুখ হইয়াছে।

এই কারণেই আচার্য শঙ্করের কথিত বিবেক, বৈরাগ্যাদি প্রতিষ্ঠার পথে অধিকারী হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনরূপ সাধনার প্রয়োজনই হয় নাই। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের বীজ লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না। ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বীজাকারে বা কুঁড়ির মতই ভিতরে রহিয়াছে ; কালক্রমে স্বভাবধর্মে তাহা আপনা হইতেই পূর্ণ-প্রকাশিত বা প্রস্ফুটিত হইবার অপেক্ষা মাত্র।

আত্মসাক্ষাৎকারের বীজটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই

বালককালে তিনি এমন নির্জনতা-প্রিয়, নিঃসঙ্গ, একক-স্বভাবের হইয়াছিলেন। পাঁচ-ছয় বৎসরের বালককালের নিজের একটি সন্ধ্যাকালীন চিত্র তিনি এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন দেখা যায়, "এই নিস্তব্ধ-প্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।"

আর একটু বড় হইয়া নিজের এই একই চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন—"সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।" নিজের বাল্যজীবনকে রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি কথার মধ্যে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন, "আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দেইনি, পাস করিনি, মাষ্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মত বেরিয়ে পড়েছিল।"

অন্তরগর্ভে যে ব্রহ্মবীজ তিনি জন্ম হইতেই ধারণ ও বহন করিতেছিলেন, তাহারই প্রভাব তাঁহার বালককালের এই চরিত্রে ও স্বভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই কাহাকেও গাছের পাতা ছিঁড়িতে দেখিলে ছয়-সাত বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ এমন মর্মবেদনা অনুভব করিতেন, এই কারণেই ছয়-সাত বৎসরের বালক বাড়ীর ছাদে উঠিয়া আকাশের দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া উদাসী ও আনমনা হইয়া যাইতেন।

বীজমাত্রেরই পুষ্টি, পূর্ণতা এবং প্রকাশের জন্য অনুকূল ক্ষেত্রের প্রয়োজন : ঊষর মরুভূমিতে ভালো বীজও ব্যর্থ, আবার দুর্বল বীজও রসের জোরে কঠিন পাথর ঠেলিয়া আকাশের আলোকে ডালপালা মেলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবীজটি কিরূপ পরিবেশ বা প্রতিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার একটু সংবাদ লওয়া আবশ্যক।

এগারো বারো বৎসরের পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরেই বালক রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখিতে পাই হিমালয়ে, পিতা মহর্ষির সঙ্গে তিনি হিমালয়-ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আকস্মিক বা অর্থহীন ঘটনামাত্র নহে : যাঁহার ইঙ্গিতে সর্বকিছু নিয়ন্ত্রিত, তাঁহারই অদৃশ্য নির্দেশে এই সময়ে ঋষি-বালকের এই হিমালয়ে আগমন। হিমালয় শিবভূমি, হিমালয় যোগভূমি এবং হিমালয় ভারতের মুনি-ঋষি-দেবতার অনন্তসঞ্চিত তপস্যার পাষাণঘন মূর্তি—ব্রহ্মবীজের পোষণ ও পূর্ণতার ইহাই শ্রেষ্ঠতম পরিবেশ। এই শিবভূমির অদৃশ্য মহাযোগীর হস্তধৃত কমণ্ডলুর জলে এই ব্রহ্মবীজের অভিষেক-স্নান আবশ্যক, তাই অদৃশ্যের আমোঘ আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের এখানে না আসিয়া উপায় ছিল না।

ভারতের সনাতন তপোভূমি "যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।"—হিমালয়ে আসিয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের মনোভাব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন যে, এখানে আসিবার পর পিতা মহর্ষি গীতার মনোমত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেগুলি "বাংলা অনুবাদ সহ আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন।" সর্বোপনিষদ দোহন করা গীতার অমৃতরস হইল এখানে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক পানীয়। তারপর তিনি বলিয়াছেন, হিমালয়ে বসিয়া "আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশী বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম।" হিমালয়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া এযুগের ঋষিকবি এইভাবেই আদিকবির নিকট কাব্যদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, "প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।"

ভিতরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বীজ, স্থান ব্রহ্মভূমি হিমালয়, সঙ্গে পিতা মহর্ষি এবং উপনিষদের ব্রহ্মমন্ত্রআবৃত্তি নিত্যকর্ম, বীজের পরিপোষণের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম পরিবেশই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দেখা যাইতেছে। কাজেই তাঁহার 'মোক্ষোৎপাদক কর্মসকল' একটু বিশেষ দ্রুততার সহিতই ফলোন্মুখ হইয়াছে, ইহাও দেখা যাইবে।

আত্মসাক্ষাৎকারের বীজটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আমরা দেখিলাম। অতঃপর 'মোক্ষোৎপাদক কর্মসকলের ফলোন্মুখ' হইবার যে কথা ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আঠারো-ঊনিশ বৎসরের একটি ঘটনাকেই এই সম্পর্কে প্রথম প্রমাণ বা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতেছে। ঘটনাটি সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এমন সময় আমার মধ্যে হঠাৎ কী একটা উলট-পালট হইয়া গেল।" উলট-পালট বলিতে এই জীবনেই নব জন্মান্তর বা আমূল রূপান্তরই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বস্তুত এই ঘটনাটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ, তাঁহার জৈব সত্তার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন। এই ঘটনাটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে তমসা হইতে জ্যোতিতে প্রথম জাগরণ, অসৎ হইতে সত্যে প্রথম উত্তরণ এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে প্রথম আস্বাদন। এই ঘটনাটি ত্যাগ করিলে রবীন্দ্রনাথের ঋষিজীবনীর ভিত্তিটিই অপসৃত হয়।

'জীবন-স্মৃতি' হইতে ঘটনাটির বিবরণ প্রথম গ্রহণ করা যাইতেছে—

"যখন বয়স হইয়াছে, হয়তো আঠারো কি ঊনিশ হইবে। একদিন ভোরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া চাহিয়া ছিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, এক অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে

স্তরে যে একটা বিষাদের আস্তরণ ছিল, তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমার আবরণ খসিয়া পড়িল, মনে হইল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিলাম, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখিলাম।"

ঘটনাটি যে তাঁহার জীবনেই জন্মান্তর ঘটাইয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথ গোপন করেন নাই। তাই আশি বছরের আয়ুর প্রান্তে উপনীত হইয়া পিছনের সমগ্র জীবনকে দেখিতে গিয়া এই ঘটনাটিই তিনি একান্তভাবে আপন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছেন। আঠারো-উনিশ বছরের ঘটনাটি সম্বন্ধে আশি বছরে আসিয়া তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন, "সেই একদিন তখন বালক ছিলাম—জানিনে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানব সম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল।"

এই উপলব্ধিটিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'সত্যকে দেখা', 'অন্তরাত্মাকে দেখা'। কিন্তু ইহাই যে প্রকৃত সত্যসাক্ষাৎকার বা আত্মদর্শন, তার প্রমাণ কি? প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে জানা দরকার যে, আত্মদর্শন কি।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞানকে বলিয়াছেন, 'প্রসংখ্যান' অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক, এই দর্শন বা বিবেকজ্ঞান। এই 'প্রসংখ্যান'-বান্ পুরুষকেই পূর্বোদ্ধৃত সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, 'বিশেষদর্শী'। চিত্ত হইতে চৈতন্যকে যিনি পৃথক্‌রূপে দেখিয়াছেন, তিনিই এই 'বিশেষদর্শী'। এই 'বিশেষদর্শন'টিই যে রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে, তাঁহার প্রথম উপলব্ধিতেই সে সম্পর্কে প্রমাণ রহিয়াছে।

এই বিশেষদর্শন হইয়াছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই—"আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আস্তরণ ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"

এখানে নিজের অন্তঃকরণকে বা হৃদয়কে দেখার কথা আছে, আর যে আলোতে তাহা দেখিয়াছেন, তাহার কথাও আছে। অন্তঃকরণকে দেখা মানেই মহর্ষি পতঞ্জলির কথিত 'চিত্ত'কে দেখা; আর, 'বিশ্বের আলোক' বলিতে 'চৈতন্য'কেই রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন। আশি বছরের পরিণত অবস্থায় এই ঘটনা সম্বন্ধে তাই তিনি একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন দেখা যায়,—'আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল।'

যেটুকু সামান্য বিশ্লেষণ করা হইল, তাহাতে জানা গেল যে, মহর্ষি পতঞ্জলির

যোগসূত্রের বিচারে রবীন্দ্রনাথ 'বিশেষদর্শী', অর্থাৎ 'চিত্ত হইতে চৈতন্যকে পৃথক্-রূপে' তিনি দেখিয়াছেন। যোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব এই দেখাকেই বলিয়াছেন—'আত্মসাক্ষাৎকার'। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই উপলব্ধিকে বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—"*সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিলাম, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখিলাম।*" *আত্ম-সাক্ষাৎকারের যে বীজের কথা ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে এবং যাহা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ* জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলব্ধিটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই ব্রহ্মবীজেরই প্রথম ফলরূপ প্রকাশ।

ঘটনাটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ইহাও বলিয়াছেন,—"এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।"

কথাটির অর্থ কি? অর্থ বুঝিতে হইলে উপনিষদের একটু সাহায্য লইতে হইবে।

উপনিষদ বলেন,—"ঈশাবাস্যং সর্বমিদং"—এই জগতের সর্বকিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, অথবা এই জগতের সর্বকিছুতেই ঈশ্বর বাস করেন (তিনি বাস করেন বলিয়াই বস্তুকে বলা হয় 'বস্তু')॥

কিন্তু আমরা সর্বকিছুকেই দেখি, যিনি ইহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া আছেন, কিম্বা যিনি ইহাদের অন্তরে বা আড়ালে আছেন, তাঁহাকে কখনো আমরা দেখি না। কেন? উপনিষদ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"- এই সমস্ত ভূতজগৎ আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে স্থিত এবং পরিণামে আনন্দেই অবসিত।

কিন্তু আমরা ভূত-জগতকেই দেখি, সেই 'আনন্দ'-কে দেখি না। কেন? উপনিষদ বলেন,—

"সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি-বিদ্যুৎ কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না, তবেমভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"—তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সর্বকিছু প্রকাশমান, তাঁহারই জ্যোতিতে এই সর্বকিছু প্রকাশিত॥

কিন্তু আমরা প্রকাশমান জগতকেই দেখিতেছি, যে-জ্যোতিতে তাহা প্রকাশিত, তাহাকে দেখি না। কেন?

নিশ্চয় কোথাও কোন পর্দা, আবরণ, আচ্ছাদন কিছু রহিয়াছে, তাই ঈশাবাস্যং সর্বমিদং-এর ঈশকে দেখি না; খল্বিমানি ভূতানি যে-আনন্দ হইতে জাত, সে-আনন্দকে দেখি না; যে-জ্যোতি সর্বকিছু প্রকাশক, সেই জ্যোতিকে দেখি না। অদৃশ্য এক আবরণ নিশ্চয় রহিয়াছে, তাই জগতের নামরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে

যে 'সদায়তন' তাহা আমরা দেখি না; নামরূপের প্রকাশই শুধু আমরা দেখি, তাহার 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' (সৎচিৎ-আনন্দ) রূপটি আমরা এই আবরণের জন্যই দেখি না।

কি সে আবরণ, যাহাতে আমাদের আত্মা আমাদের দৃষ্টিতেই আবৃত বা অদৃশ্য? কি সে আচ্ছাদন, যাহাতে এই জগতের অন্তর্যামী ব্রহ্ম জগতের দৃষ্টি হইতেই গোপন বা অদৃশ্য? উপনিষদ সেই আবরণ বা আচ্ছাদনকেই বলিয়াছেন—'অবিদ্যা' বা তমসা'।

এই অবিদ্যা বা তমসা কাহাকে আবৃত করিতেছে? জগৎ অনাবৃত নিত্য-প্রকাশিত, এখানে কোন আবরণই নাই। আর, ব্রহ্মকে আবৃত করিবে, এতবড় তমসা বা অবিদ্যা কোথায়? ব্রহ্ম যিনি বৃহৎ, যিনি পূর্ণ, যিনি ভূমা, তাঁহাকে যেমন কেহ প্রকাশিত করিতে পারে না তেমনি তাঁহাকে কেহ আবৃতও করিতে পারে না। উপনিষদ বলেন, এই অবিদ্যায় আমরাই আচ্ছাদিত, এই তমসায় আমরাই আবৃত। এই জন্যই উপনিষদের ঋষির প্রার্থনা—সরাও আমার এই আবরণ, সরাও সর্বগ্রাসী আমার এই তমসা, দেখাও তোমার সেই জ্যোতিষাং জ্যোতি।

উপনিষদের এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত উপলব্ধিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই অবিদ্যা-আবরণ অপসৃত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—"হঠাৎ এক মুহূর্তে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।"

পর্দা সরিয়া গিয়াছিল, কাজেই এতদিনের অভ্যস্ত চোখদিয়া-দেখার পরিবর্তে একেবারে চৈতন্য দিয়াই দেখার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। সেই চৈতন্যদিয়া-দেখাটাকেই তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"দেখিলাম এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন"।

ইহাই উপনিষদের সেই 'ঈশাবাস্য সর্বমিদং' দেখা। চৈতন্য দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিয়াছেন—"দেখিলাম আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।" ইহাই উপনিষদের সেই "আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইহাই তো উপনিষদের সেই 'রস বৈ সঃ'-এর রূপকে দেখা।

দৃষ্টির আবরণ সরিয়া গেলে শুধু কি জগতেরই সত্যরূপ উদ্ঘাটিত হয়? নিজের স্বরূপ কি তখনো আবৃত থাকে? না, উপনিষদ বলেন, তখন জীব ও জগৎ, অন্তর ও বাহির দুইয়েরই সত্যরূপ অনাবৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'হৃদয়ের আস্তরণ ভেদ' হইবার কথা আছে। হৃদয়ের আবরণ ভেদ হইলে কি দেখা যায়? রবীন্দ্রনাথ

দেখিতে পাইয়াছেন যে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বিষাদ ছিল, তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া সর্বত্র জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ের আস্তরণ গেলে থাকে অনাবৃত হৃদয়। আর সেই অনাবৃত হৃদয়ের 'বিষাদ' গেলে থাকে কি? থাকে অনাবৃত আনন্দ। আর, যে জ্যোতি হৃদয় ভেদ করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, থাকে সেই জ্যোতি। দৃষ্টির আবরণ সরিলে হৃদয়ে এই যে আনন্দ, এই যে জ্যোতি প্রকাশিত হয়, ইহা কি? তাহাই ব্রহ্মের প্রকাশ-রূপ এই জীবদেহে এবং তাহাই জীবের আপন প্রকৃত স্ব-রূপ। কাজেই, দেখা গেল যে, জগতের সত্যরূপের সঙ্গে নিজের আত্ম-স্বরূপও এই প্রথম উপলব্ধিটিতেই রবীন্দ্রনাথের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আঠারো-ঊনিশ বৎসর বয়সের প্রথম উপলব্ধির মধ্যে দুইটি বিশেষ-দর্শন লক্ষিত হয়—ব্রহ্মের জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দরূপ।

কিন্তু এই উপলব্ধিটি যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, কিছুকাল পরে তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে; দৃষ্টির উপর হইতে যে পর্দা সরিয়া গিয়াছিল, তাহা আবার যথাস্থানে নামিয়া আসিয়াছে। উপলব্ধিটি বিবরণের উপসংহার রবীন্দ্রনাথ এইভাবে করিয়াছেন,—

"জগতের আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।. . . .কিছু-কাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। .. পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইল এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক, তাহাকে আর শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।"

আত্মার জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দরূপ যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে আবার আবরণ নামে কেমন করিয়া?

প্রশ্নটির উত্তরে প্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মদর্শন আর ব্রাহ্মীস্থিতি এক বস্তু নয়। ব্রহ্মজ্যোতিদর্শন হইলেই ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠা হয় না, আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ হয় না। ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শনের অর্থ হইল জ্ঞানলাভ। যোগসূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি এবং যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠ জ্ঞানের সপ্তভূমির কথা বলিয়াছেন। এই জ্ঞানভূমি একটির পর একটি ক্রমে ক্রমে জয়

করিয়া জ্ঞানের সপ্তম ভূমিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন চির-অপসৃত হয়, কেবল তাঁহারই দৃষ্টি নিত্য মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন সাধন-পন্থা অনুসরণ করিয়া একটির পর একটি প্রজ্ঞাভূমি জয় করিয়া অবশেষে আত্মজ্যোতি দর্শন করেন নাই। কাজেই সপ্তম ভূমির প্রজ্ঞা জ্যোতি অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইলেও সে-ভূমি তাঁহার লব্ধ ভূমি হয় নাই। তাই দৃষ্টিতে আবার পূর্বের আচ্ছাদন নামিয়া আসিয়াছে।

যোগসূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি আরও বলিয়াছেন, 'যে যোগীর চিত্ত বিবেক-পথে কৈবল্যের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, ছিদ্র পাইলে তাহার চিত্তও পূর্ব সংস্কারসমূহে আচ্ছন্ন হয়।' সধানায় যাঁহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইয়াছে, সেই উচ্চ-সাধক সম্বন্ধেই এই উক্তি যোগসূত্রে করা হইয়াছে।

আর রবীন্দ্রনাথের আত্মজ্যোতিদর্শন বিনা সাধনে এবং অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, কাজেই তাঁহার চিত্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও পূর্ব সংস্কারসমূহ হইতে এত সহজে এবং এত সত্বর কখনো মুক্ত হইতে পারে না, তাহা সাধনা সাপেক্ষ। এই কারণেই ব্রহ্ম-জ্যোতি রবীন্দ্রনাথের নিজেকে ও জগৎকে দেখাইয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আবার পূর্বের আবরণ নামিয়া আসিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দেবের একটি উক্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলিয়াছেন যে, এমন গাছও আছে, যার আগে ফল পরে ফুল। অর্থাৎ, আগে সিদ্ধি পরে সাধনা, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। পরমহংসদেবের নিজের জীবনই সেই দৃষ্টান্ত।

বয়স তখন তাঁহার দশ কি এগারো, একদিন পাশের আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীকে দেখিতে চলিয়াছেন, মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পান যে আকাশে বক উড়িয়া চলিয়াছে। দেখিয়াই তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে আনা হয়। পরবর্তীকালে নিজেই তিনি এই ঘটনার কথায় বলিয়াছেন, "দশ-এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে অবস্থা হয়। কি দেখলাম!—একেবারে বাহ্যশূন্য।"

অকস্মাৎ চৈতন্যের মহাকাশটি ভিতরে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই আকাশেই তিনি ধাবমান বলাকা শ্রেণীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উপনিষদেও ব্রহ্মের এক নাম বলা হইয়াছে—আকাশ। পরমহংসদেব অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সেদিন তিনি ব্রহ্মজ্যোতিই দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাই পরমহংস-

দেবের প্রথম ব্রহ্মজ্যোতি-দর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারও নিকটে ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিরূপই প্রথম অনাবৃত করিয়াছিলেন দেখা যায়।

পুরাণে দেবর্ষি নারদের প্রথম উপলব্ধির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

বাল্যকালে একদিন অকস্মাৎ নারদের দৃষ্টির সম্মুখে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন এবং পরমুহূর্তে অদৃশ্য হন। নারদ তখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, "তুমি কোথায় ?" অদৃশ্য আকাশ হইতে উত্তর আসিল, "আমি নিজেই তোমাকে দেখা দিয়াছি, এখন তুমি আমাকে খুজিয়া বাহির কর।" নারদ কাঁদিয়া বলিলেন, "এজগতে সব কিছুকেই দেখিতেছি, কিন্তু তোমাকে তো কোথাও দেখি না। কেমনে এ জগতকে পার হইয়া তোমাকে আমি কোথায় খুঁজিয়া বহির করিব ?"

এবার অদৃশ্য আকাশের আশ্বাসবাণী নারদ শুনিতে পাইলেন, "হে নারদ, আমি যাঁহাকে স্পর্শ করি, তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে-শক্তি আমার সৃষ্ট জগতের নাই ; আমি যাঁহাকে দেখা দেই, সংসারের সাধ্য কি তাঁহার দৃষ্টি হইতে আমাকে দীর্ঘকাল আড়াল করিয়া রাখে।"

দেবর্ষি নারদ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রথম উপলব্ধির সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। নারদ আশ্বাসবাণী শুনিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম যাঁহাকে স্পর্শ করেন, জগৎ-সংসার আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অর্থাৎ, তাঁহার দৃষ্টিতে তখন জগৎ আর জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা শেষ নহে, নিজের অতীত এক সত্তাতেই যে জগৎ ধৃত, এই সত্য তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বদাই উদ্ঘাটিত থাকে।

আর রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাটিই অন্যভাবে বলিয়াছেন।

"পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল এখন কৌটা দেখিতেছি। কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক, তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।"

কৌটা বলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত এই জগৎ-সংসারকেই বুঝাইয়াছেন এবং ইহার অন্তরালে বা অতীতে যিনি অদৃশ্য রহিয়াছেন, তাঁহাকেই বলিয়াছেন কৌটার অভ্যন্তরে রত্ন এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বিস্মৃতি বা ভ্রমের আশঙ্কা হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন, প্রথমদর্শনের পরে এই দৃঢ় আত্মঘোষণাই তিনি করিয়াছেন। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—তাঁহার সামান্যতম দর্শন-

স্পর্শনই জীবকে মহৎ ভয় অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে॥

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এত জোর দিয়া বলিতে পারিয়াছেন যে, "ভ্রমের আশঙ্কা হইতে" তিনি চিরকালের জন্য ত্রাণ পাইয়াছেন।

পরমহংসদেব আগে ফল পরে ফুল, অর্থাৎ আগে প্রাপ্তি পরে সাধনার কথা বলিয়াছেন। দেবর্ষি নারদের আখ্যানেও আগে ভগবানকে দেখা পরে তাঁহাকে খোঁজার কথা আছে। ব্রহ্মের কোনরূপ প্রকাশ যাহাদের জীবনে প্রথমে হয়, তাঁহাদের জীবনে সাধনা স্বভাব-নিয়মে আপনা হইতেই হইয়া থাকে। যাঁহাকে পলকের জন্য দেখা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে পাইবার জন্য তখন একটা তীব্র ব্যাকুলতা সর্বক্ষণ সাধকের অন্তরে নদীধারার মত বহমান থাকে। এই তীব্র ব্যাকুলতাই একটির পর একটি সাধনার স্তর বা ঘাট পার করিয়া সাধককে আগাইয়া লইয়া চলে। যিনি গুহাহিত, যিনি অন্তর্যামী, তিনি হৃদয়ের আবরণ সরাইয়া দেখা দিয়াছিলেন, সেই অন্তরবাসী 'অন্তর্যামী অমৃত আত্মা'-কে তখন হৃদয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত অহর্নিশ চলিতে থাকে এবং ইহারই নাম সাধনা।

এই সাধনা রবীন্দ্রনাথকেও করিতে হইয়াছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথকে দিয়া এ সাধনা করাইয়া লওয়া হইয়াছিল, পরবর্তী কালের ঘটনা এবং উপলব্ধিসমূহ হইতে তাহার প্রমাণ আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

পূর্বেই মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং ব্যাসভাষ্যের নির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ আত্মসাক্ষাৎ-কারের বীজটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আত্মসাক্ষাৎকারের বীজটি ভিতরে ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথকে কোন স্বতন্ত্র বা বিশেষ সাধনা করিতে হয় নাই; সেই বীজটির ক্রমঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের যে অবস্থা বা পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, তাহাই ভাষান্তরে একটির পর একটি সাধন অবস্থার স্তর অতিক্রম করা, অথবা একটির পর একটি জ্ঞানভূমি বা সাধন-ভূমি লব্ধ হওয়া।

নিজের উপলব্ধির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে উপনিষদের একটি মন্ত্র বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রটি কঠ ও মুণ্ডক উভয় উপনিষদে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এই,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম"—এই ব্রহ্মকে বহু সাধ্যায়, অর্থাৎ বেদপাঠ সহায়ে, অথবা মেধা বা ধারণাশক্তি সহায়ে, কিম্বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও

জানা যায় না। যাঁহাকে ইনি বরণ করেন অর্থাৎ কৃপা করেন, তাঁহারই নিকট এই ব্রহ্ম স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন॥

ব্রহ্মই রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের সেই প্রকাশই পরে ব্রহ্ম আকর্ষণে পরিণত হয় এবং এই আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথকে যে পথে আগাইয়া লইয়াছিল, সেই পথের নাম বা বিবরণই সাধনা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। অর্থাৎ, এটা কোনমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আজ পর্যন্ত কোন মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন, সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে।"

রবীন্দ্রনাথকেও যে সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানেই আলোচ্য। আপাতত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, রাণী চন্দ এবং মৈত্রেয়ী দেবী উভয়ের গ্রন্থেই এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

একদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথকে হঠাৎ বিছায় কামড় দেয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে, বৃশ্চিক দংশনে কিরূপ জ্বালা হইয়া থাকে। অসহ্য যন্ত্রনায় রবীন্দ্রনাথও অস্থির হইয়া উঠেন, কিন্তু গৃহের সকলেই নিদ্রিত ; তাঁহার যন্ত্রণার জন্য আর সকলের ঘুম ভাঙিবে, এই চিন্তাও রবীন্দ্রনাথের ভদ্রমনের পক্ষে অসহ্য, ফলে ঔষধের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই।

এই অবস্থায় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জাগে—আচ্ছা বিছার কামড়ের এই ব্যথা কে ভোগ করিতেছে? মনেই উত্তর আসিল—দেহধারী রবীন্দ্রনাথ নামক যে-ব্যক্তি, তাঁহারই এই ব্যথা, আসল আমির তো কোন ব্যথা থাকিতে পারে না। এই চিন্তা বা বোধের ফল কি হইল, তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বমুখেই শোনা যাক, তিনি বলিয়াছেন,—

"যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে আমি নয়—হঠাৎ মনে হোল যেন কী রকম একটা যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সে মুহূর্তে যত চেতনা।"

সামান্য বিশ্লেষণেই বুঝা যায় যে, দেহ হইতে মনকে তথা চৈতন্যকে রবীন্দ্রনাথ সরাইয়া লইয়াছিলেন, তাই অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণার কোন বোধই আর তাঁহার ছিল না। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

"যেন কী রকম একটা যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।"

কাহার সঙ্গে কাহার যোগসূত্র ছিন্ন হইল? দেহের সঙ্গে দেহী বা দেহধারীর। এই যোগসূত্রটি কি, যাহা ছিন্ন হইয়াছে? দেহ বোধ বা দেহ চৈতন্যই সেই যোগ-সূত্র। এই বোধ কাহার থাকে না? যে মৃত, যে মূর্ছাতুর সংজ্ঞাহারা, যে গভীর সুষুপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন, সজ্ঞানেই তিনি দেহ হইতে আলাদা হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রেও দেখা যায় যে, মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেন—

"যদি দেহ পৃথক কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্ত ভবিষ্যসি॥"

দেহ হইতে পৃথক হইয়া চিত্তে বিশ্রাম লাভ যে করিতে পারে, তাহারই পরম সুখ, শান্তি ও বন্ধনমুক্তি ঘটিয়া থাকে॥

ইচ্ছা করিলেই কেহ কখনো নিজেকে নিজের দেহ হইতে পৃথক করিতে পারে না, এ শক্তি যোগসিদ্ধ পুরুষদের পক্ষেই সম্ভবপর। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজ দেহ হইতে পৃথক করিবার কৌশল জানিতেন। এই কৌশলেরই নাম যোগ এবং এ যোগ কদাচ সাধনা ব্যতীত কাহারও আয়ত্তগত হয় না।

আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতেছে; মৈত্রেয়ী দেবী 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'—গ্রন্থে ঘটনাটির বিশদ বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় আশি। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই—

সন্ধ্যার পরে রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বাড়ীর সকলে সমবেত হইয়াছেন, স্বয়ং কবি একটির পর একটি নিজের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন ব্যাখ্যা করিতেছেন, নিজের বহু গান একটির পর একটি গাহিয়া শুনাইতেছেন, ইহার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাসারও অজস্র পরিবেশন চলিয়াছে, আনন্দ ও তৃপ্তিরসে তিনি সকলের হৃদয়পাত্র সেদিন কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়াছিলেন।

বহুক্ষণ হয় এই আনন্দ আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক সময়ে গৃহকর্ত্রী (লেখিকা) ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে, রবীন্দ্রনাথ একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ! ইনিই কি কিছু পূর্বে কবিতায় গানে হাস্যে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিলেন? একেবারে অপরিচিত এক রবীন্দ্রনাথ, ইনি যেন এ জগতের কেহ নহেন।

কথাটা গৃহকর্ত্রী অতি সন্তর্পণে এবং সভয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেন,—"আপনি

যখন চুপ করে বসেছিলেন, তখন আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলুম।......মনে হয় না আপনি আমাদের কেউ।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"সত্যি কথাই বলব, আমি তোমাদের কেউ নই। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম, চিরদিন মনে মনে আমি উদাসী। তাই একদিন লিখেছিলুম—আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। এ কিন্তু একটা কবিত্বের কথা মাত্র নয়। লোকে মনে করে, এটা কবির একটা মুডমাত্র। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আমার জীবনের একটা গভীরতম সত্য যে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

এখানে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম।"

নির্মম মানে নিষ্ঠুর নয়, নির্মম মানে মমতাশূন্য, নিরাসক্ত ও বন্ধন শূন্য। ভিতরের সেই নির্মম নিরাসক্ত মনের নির্জন গুহায় তিনি সরিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সেদিন এজগতের লোক বলিয়া মনে হয় নাই, অত্যন্ত অপরিচিত অতি-দূরের মানুষ মনে হইয়াছে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, মনের ঐ মুক্ত-ভিতরটিতে কি ইচ্ছা হইলেই যাওয়া যায়, না সকলেই যাইতে পারে? বহু সাধনায় ও অভ্যাসে মনের ঐ নিরাসক্ত ভূমি লব্ধ হইয়া থাকে। মনের ঐ ভূমিতে যাঁহার যাতায়াত আছে, অথবা মনের ঐ ভূমির যিনি বাসিন্দা, তিনিই বলিতে পারেন "আমি তোমাদের কেহ নই, আমি সুদূরের।"

আত্মা যেমন দেহে থাকিয়াও দেহের অংশ নহে, সূর্যের আলো যেমন জগতের সর্বকিছুর উপর পড়িয়াও জগতের নহে, এই অবস্থানও তদ্রূপ। দেহে থাকিয়াও এই দেহাতীত বা বিদেহী স্থিতি সিদ্ধ সাধকেরই হইয়া থাকে। আর সাধনা ব্যতীত এ-সিদ্ধি আসে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত চিত্র বা অবস্থা তাঁহার জীবনের আড়ালে সঙ্গোপনে গূঢ় এক সাধনারই সিদ্ধির পরিচায়ক বা চিহ্ন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপলব্ধিটির মধ্যে ব্রহ্মের জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দরূপ এই দুইটি বিশেষ দর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই দুইটি দর্শনের তেমনি দুইটি গভীর প্রভাবও তাঁহার পরবর্তী সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে—একটি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে, অপরটি তাঁহার সাহিত্য-সাধনায়।

প্রথম প্রভাবটির ফলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে সূর্য একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। একদিন উদয়-আকাশে প্রভাতসূর্যের আবির্ভাবের সংগে সংগে অকস্মাৎ তাঁহারও হৃদয়-আকাশের আবরণ অপসারিত হইয়াছিল, দেখা দিয়াছিল সে-আকাশে ব্রহ্মজ্যোতি। এই কারণেই সূর্য এবং ব্রহ্মের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে যোগযুক্ত, তাই সবিতা রবীন্দ্রনাথের নিকট ব্রহ্মদূতী।

যে-বিগ্রহ বা মন্ত্রের মাধ্যমে ইষ্টের সংগে সাধকের মিলন ঘটে, সিদ্ধাবস্থাতেও সেই বিগ্রহ বা মন্ত্র সাধকের আরাধ্যরূপেই থাকে। এই কারণেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বারম্বার বলিয়াছেন—সূর্যপূজারী, সূর্যোপাসক।

বস্তুত সৃষ্টজগতে সূর্যই একমাত্র ব্রহ্মের যথার্থ প্রতীকরূপে ঋষিসমাজে উপাসিত ও বন্দিত হইয়াছে। পৃথিবীতে সর্ববস্তুই আপন প্রকাশের জন্য সূর্যের আলোর অপেক্ষা করে, কিন্তু সূর্য স্বয়ং নিজে[illegible]ই সংগে জগতকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ এই [illegible]টি সৃষ্টিতে একমাত্র সূর্যই ধারণ ও

বহন করিতেছে। কাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদের নিকট সূর্য ব্রহ্মের প্রতীকরূপে উপাস্য ও পূজিত। রবীন্দ্রনাথও গোত্রে ও ধর্মে সেই ঋষি ; কাজেই কোন মূর্তি বিগ্রহ মন্ত্র ইত্যাদির পরিবর্তে সূর্যই যে ব্রহ্মের দূতরূপে তাঁহার জীবনে অবিভূর্ত হইবে, ইহা আদৌ আকস্মিক নহে, ইহাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন যে, প্রত্যহ প্রভাতসূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁহার করা চাই-ই এবং যেদিন সূর্যের দেখা না পান, সেদিন দিনটাই তাঁহার ব্যর্থ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এই কারণেই কখনো কোথাও গেলে আবাসস্থানে পূর্বদিকের ঘরই তিনি বাছিয়া নিতেন, যেন প্রভাতে উঠিয়াই প্রিয়তমের জ্যোতির্ময়ী আকাশদূতীকে তিনি সময়মত অভ্যর্থনা করিতে পারেন। ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাত্যহিক এবং একমাত্র উপাসনা। পৃথিবীর সকল কবি বা সাধক একত্র মিলিয়াও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত সূর্যবন্দনা করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সূর্য কি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহার একটু বিবরণ বা দৃষ্টান্ত দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার সূর্যোপসনার আরম্ভ তিনি এইভাবে করিয়াছেন—

প্রতিদিন যে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকে অনুসরণ ক'রে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক॥

ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের কন্ঠে বৈদিক ঋষির মত প্রার্থনা-মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে—

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি,—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।
বলি,—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে
আমার অন্তরতম সত্য ॥

অন্য একটি সূর্য স্তবে তিনি বলিয়াছেন—

"হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত ॥"

প্রথম উপলব্ধিটির প্রথম প্রভাবের ফলে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে সূর্য-পূজারী বা সূর্যোপাসক। এই প্রভাবটির ফলেই তাঁহার নিজস্ব সাধনার ধারা বা পথটি উন্মুক্ত হইয়াছে—সে সাধনা হইল সূর্য-সাধনা।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উপলব্ধিটির দ্বিতীয় প্রভাবটির সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে, সেখানে তিনি সূর্যপূজারী; দ্বিতীয় প্রভাব তাঁহার সাহিত্য-জীবনে, সেখানে তিনি আনন্দের উপাসক।

প্রথম উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট জগতের আনন্দরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, ইহার ফলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় কখনো নিছক রূপসৃষ্টিকে রসসৃষ্টিকে তিনি লক্ষ্য বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় যে রূপের সাধনা দেখা যায়, তাহা আনন্দ-সাধনা, আর এই 'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ' উপনিষদ বলেন। তাই তিনি সাহিত্যে যে রসসৃষ্টির সাধনা করিয়াছেন, তাহা আনন্দময়ের 'রসো বৈ সঃ'-এর সাধনা।

এই প্রথম উপলব্ধিটি সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাই এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।......তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেই জন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।"

এই প্রথম অভিজ্ঞতাটিই তাঁহার কবি-জীবন বা সাহিত্য-সাধনায় নির্ঝরের

স্বপ্ন ভঙ্গ। এই জীবনধারা কোন পরিণতি গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের নিজের আত্মপরিচয় হইতেই তাহা শোনানো যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

"এই সত্তর বৎসর নানাপথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।......আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই,......শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য ; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্রজ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত।......তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি, সেই যথেষ্ট। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, তাদের সকলের বন্ধু আমি, আমি কবি।"

এই কবিই মাটিকে তাঁহার কবিজীবনের শেষ প্রণাম জানাইয়া গিয়াছেন –

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।।"

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিনা, ইহাই আমাদের বিচার্য প্রশ্ন। সাধকের আপন 'উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য' এই কষ্টিপাথরটি আমরা গ্রহণ করিয়াছি প্রশ্নটির বিচারের জন্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিটির বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, অধুনা তাহার দ্বিতীয় একটি উপলব্ধিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যাইতেছে।

তখন রবীন্দ্রনাথ পদ্মায় বোটে থাকেন, সেখানে তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল লোকালয় হইতে দূরে। মাঝে মাঝে তিনি সাজাদপুরে আসিতেন, খালের পারে একটা বাড়ি তাহার দোতালার ঘরে তিনি থাকিতেন। খালের এ-পারেই ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা, তাঁহার দোতালার ঘর হইতে লোকালয়ের এই লীলা তিনি অবসর মত দেখিতেন। সেই সময়কার একদিনের উপলব্ধির কিছু বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের প্রথম উপলব্ধিরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া বাহ্যত মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক গভীরতম উপলব্ধি। উপলব্ধিটির যে-বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই--

"দোতালার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে, তাদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা

প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখন্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করচি, যা ভোগ করচি, চারিদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেচে, সমস্ত এক হয়েচে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেচে নানা নটকে নিয়ে, সুখ দুঃখের নানা খন্ড-প্রকাশ চলচে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-যাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্চে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখ-দুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য-সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

"এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খন্ডকে স্থাপন করবা-মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম ক্ষণকালের অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন, ইচ্ছা করচে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করচেন তাঁর নিত্যে। এষোহস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে– এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ॥"

এই উপলব্ধির মধ্যে প্রধান বা মূল কথা যেটি, তাহাকেই প্রথম গ্রহণ করা যাইতেছে। সেই প্রধান কথাটি হইল এই–"এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।" এখন প্রশ্ন, কে এই 'নিত্য-সাক্ষী' ?

ইনিই যে অন্তর্যামী ব্রহ্ম, তাহা আমরা একটু পরেই যথাস্থানে দেখিতে পাইব। আপাততঃ এইটুকু বলিয়া রাখা যাইতেছে যে, এই নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও দ্রষ্টার আসনে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলেই খন্ডকে উত্তীর্ণ হইয়া 'অখন্ডলীলাকে' দেখা সম্ভবপর হয় ; তাঁহার পাশে স্থান গ্রহণ করিলেই 'সমগ্রের মধ্যে খন্ড' আপন অর্থ ও সার্থকতা পায় এবং এই নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইতে পারিলেই 'নিজের অস্তিত্বের

ভার লাঘব' হইয়া যায়। ব্রহ্মই যে এই নিত্যসাক্ষী, তাহা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বিবরণেই পাওয়া যায় ; তাই দেখা যায় যে, এই নিত্যসাক্ষীকে তিনি বলিয়াছেন—'পরমদ্রষ্টা' এবং 'সর্বানুভূঃ'।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং প্রতি দেহে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ (সাক্ষী) বলিয়া জানিবে।"

এখানে বলা হইয়াছে যে, স্থাবর-জঙ্গম সর্বক্ষেত্রে ভগবানই একমাত্র ক্ষেত্রী, সাক্ষী বা দ্রষ্টা। গীতা আরও বলিয়াছেন—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন পুরুষঃ পর ঃ॥

—এই দেহে পরমপুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা॥

পূর্বের চেয়ে আরও পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই দেহেই আছেন এবং তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা।

প্রাচীনতম উপনিষদ বৃহদারণ্যকে এই তত্ত্বটি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে : সেখানে দেখা যায় যে, জনকের রাজসভায় ব্রহ্ম-বিচারে গাগীর প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"হে গার্গী ! সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অ-দৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা।.... তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, অন্য বিজ্ঞাতা নাই॥"

উপনিষদ এই তত্ত্বই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষী। ইঁহাকেই কেনোপনিষদ বলিয়াছেন—"দৃষ্টির দ্রষ্টা" এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি"। আর তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'পরমদ্রষ্টা' এবং 'নিত্যসাক্ষী'। মানুষ বা জীব সর্বজ্ঞ নহে, একমাত্র ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ এবং সর্বসাক্ষী, এ তত্ত্ব সর্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত।

কিন্তু ইহাকেই যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? সেই প্রমাণটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে উপনিষদের একটু সাহায্য লওয়া যাইতেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জানা যায় যে, ঋষি উদ্দালকের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত", ব্রহ্মই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং তিনিই তোমার আত্মা॥ অতঃপর মহর্ষি অতি বিস্তৃতভাবে এই তত্ত্বটির উপদেশ দান করিয়াছেন—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত...ইত্যাদি"—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তরবর্তী পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে যমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং তোমার আত্মা......ইত্যাদি॥

যিনি বিশ্বসৃষ্টির কর্তা ও পরিচালক, তিনিই জীবদেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত এবং তিনিই জীবের আত্মা। এই অন্তর্যামী আত্মাকে জানিলেই সমগ্র সৃষ্টর অন্তর্যামী ব্রহ্মকে জানা হয়।

এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য উপলব্ধিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিয়াছেন—সমস্ত খন্ডকে লইয়া এক অখন্ডের নিত্যলীলা। এই নিত্যসাক্ষীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাই তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়—"কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করেছেন তাঁর নিত্যে।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে 'অন্তর্যামী অমৃত আত্মা' বলিয়াছেন, তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'আমার পরম অন্তবঙ্গ সঙ্গী' বলিযা দেখিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন।

অহং-এর কেন্দ্র হইতে দৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্য যখন এই নিত্যসাক্ষী পরম অন্তরঙ্গ সাক্ষীর কেন্দ্রে স্থাপিত হয়, তখনই দৃষ্টির আবরণ উন্মোচিত হয় এবং অখন্ড দৃষ্টির আলোতে জগতেরও সত্যরূপ আনন্দরূপ উদ্ঘাটিত হয়। ব্রহ্ম যিনি বৃহৎ, তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলে বড়োকে দেখা হয়, তখন জগতের যাবতীয় খন্ডের আড়ালে বা মধ্যেও বড়োকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন খন্ড তাহার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই অখন্ডেরই লীলা উদ্ঘাটিত করে, সীমা তাহার সীমার মধ্যেই অসীমের লীলাক্ষেত্র হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহার অলোতে চোখ মেলিলে এই বিচিত্র সৃষ্টি যে রূপ লইয়া দেখা দেয়, তাহা হইল—লীলা বা মহাকাব্য।

ব্রহ্মসূত্রেও ভগবান বেদব্যাস সৃষ্টিকে বলিয়াছেন ব্রহ্মের লীলা। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও এই সত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই। তাঁহাকেও আমরা বলিতে শুনি—"সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখন্ড লীলা।" নিত্যসাক্ষীকে দেখার কথা যদি এই উপলব্ধিতে নাও থাকিত, তথাপি শুধু এই 'অখন্ডলীলা'-দর্শন ও অনুভূতি হইতেই জানা যাইত যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলে এই বিশ্ব একটি মহাকাব্যরূপে দেখা দেয়, একথা বলা হইয়াছে। মহাকবির এই বিশ্বকাব্য দেখিয়া বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন—

অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি॥

—কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের (ব্রহ্মের) কাব্য সে-কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না॥

রবীন্দ্রনাথও যে এই দেবস্য কাব্যং-ই দেখিয়াছিলেন, তাঁহার উপলব্ধিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—

"অভিনয় চলেচে নানা নটকে নিয়ে, সুখঃদুঃখের নানা প্রকাশ চলচে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্চে পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে।"

বৈদিক ঋষি যাহাকে বলিয়াছেন 'দেবস্য কাব্যং', রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বলিয়াছেন 'নাট্য' এবং বৈদিক ঋষি যাঁহাকে বলিয়াছেন 'দেবস্য', তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'রসিক', সর্বানুভূঃ।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যাইতেছে যে, এখানে যিনি নাট্যকার, রসিক, পরম অন্তরঙ্গ সাক্ষী, নিত্যসাক্ষী ইত্যাদি রূপে অভিব্যক্ত ও অভিহিত, তাঁহাকেই তাঁহার কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'জীবনদেবতা'। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিজের আত্মপরিচয় প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খন্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত আমার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন :—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে॥"

এই 'জীবনদেবতা' এই রসিক এবং এই মহাকবিকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর বয়সে আপন আত্মপরিচয়ে ঘোষণা করিয়াছেন—

"আমি সেই বিচিত্রের দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাহিরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।...আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।"

পরবর্তীকালে ইহাকেই তিনি নাম দিয়েছেন—বিরাট পুরুষ, মহামানব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন—"এখন নাম দিয়াছি মহামানব। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, ইনি আছেন সর্বদা জনে জনের হৃদয়ে, সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতঃ।"

এখন গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথের জীবনের যে-উপলব্ধিটির আলোচনা এতক্ষণ করা গিয়াছে, আদিতেই বলা হইয়াছে যে, তাহার প্রধান কথাটি হইল—জীবন ও জগৎকে "দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে। এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খন্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল।"

উপলব্ধির এই প্রধান কথাটিই প্রধান প্রমাণ যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ঋষি। প্রমাণটির একটু শাস্ত্রীয় সমর্থন অতঃপর প্রদত্ত হইতেছে।

শ্বেতাশ্বতর এবং মুন্ডক উভয় উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই মন্ত্র দুইটি

পাওয়া যায়—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
    সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি
    অনশ্নন অন্যো অভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
    অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং সদা পশ্যতি অন্যসীশম্
    অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

—দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে ; অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু সে যখন অন্যকে (ব্রহ্মকে) দেখিতে পায়, তখন তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়॥

একই বৃক্ষে দুই পক্ষী বলিতে উপনিষদ একই দেহে জীব এবং ব্রহ্মের সহ-অবস্থিতি বুঝাইয়াছেন। জীব সংসারের সুখ-দুঃখের ভোক্তা, সংসারের শোক-দুঃখে মুহ্যমান, সে যখন তাহার সখা ব্রহ্মকে দেখে, তখন শোকের অতীত হয়, ইহাই হইল উপনিষদের মন্ত্র দুটির নির্গলিতার্থ। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির মধ্যে যাহাকে আমরা প্রধান কথা বলিয়াছি, তাহা এই মন্ত্রদুইটিরই আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে।

উপনিষদ বলিয়াছেন, "দুই সখা", আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী।"

উপনিষদ বলিয়াছেন 'এক পাখী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে', আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"দেখতে পেলুম, দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে বিচলিত করেচে"।

উপনিষদ বলিয়াছেন, 'একজন ফল ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে', আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে"।

উপনিষদ বলিয়াছেন, 'যখন জীব অন্যকে (ব্রহ্মকে) দেখিতে পায়', আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে"।

উপনিষদ বলিয়াছেন, এই দেখার পরে 'তখন সে (জীব) শোকের অতীত হয়', আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল।... একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম"।

অধিক বিশ্লেষণ আর আবশ্যক করে না, এখন বলা চলে যে, এই উপলব্ধিটিই সন্দেহাতীত প্রমাণ যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি। আপনার মধ্যে নিজেকে এবং ব্রহ্মকে তিনি দেখিয়াছেন, আর দেখিয়াছেন—জগৎ ব্রহ্মেরই আনন্দলীলা।

এত বড় প্রাপ্তি এবং এত বড় মুক্তির প্রথম প্রকাশটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একটি আনন্দ-প্রণামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই তাঁহার উপলব্ধিটির বিবরণের উপসংহারে আসিয়া পাওয়া যায়—

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন. ইচ্ছে করচে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সাক্ষী।"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-প্রণাম। যাঁহাকে তিনি প্রণাম করিয়াছেন, যাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তিনি যে ব্রহ্ম, সে কথা রবীন্দ্রনাথ গোপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার উপলব্ধির শেষ কয়টি কথাতেই তাহা ব্যক্ত-

"তখনি মনে হ'ল আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে,—এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দঃ।"

উপনিষদের একই বৃক্ষের দুই পক্ষীকে এখানে রবীন্দ্রনাথ এ এবং সে বলিয়াছেন দেখা যায়। আর সেই সে-ই এই এ-র পরম আনন্দ, ইহাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য জনককে ব্রহ্মে উপনীত করিয়া ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

হে সম্রাট, "এষাঽস্য পরমা গতিঃ এষাঽস্য পরমা সম্পদেষাঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"—হে সম্রাট, ইনিই জীবের পরমা গতি, ইনিই জীবের পরম সম্পদ, ইনিই জীবের পরম ধাম, ইনিই জীবের পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বনে সমস্ত প্রাণী ও ভূত-জগৎ জীবন ধারণ করে॥

এক কথায়, জীবের মুক্তি, পরিপূর্ণতা, আনন্দ, অমৃত ইত্যাদি সমস্তই এই ব্রহ্মের মধ্যে এবং সেই ব্রহ্ম এই দেহেই জীব-সখারূপে অবস্থিত। ইহাকেই পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী, নিত্যসাক্ষী, পরমদ্রষ্টা, সর্বানুভূঃ প্রভৃতি নামে ডাকিয়া আত্ম-

নিবেদনের প্রণাম রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন এবং প্রণামান্তে ঘোষণা
"আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল॥"

তাঁহার উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার বিবরণ কে কিভাবে গ্রহণ করিবেন এবং বুঝিবেন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়তো কিছু দ্বিধা বা সংশয় ছিল। হয়তো সাধারণের নিকট ইহার যথার্থ অর্থ বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার ভয়। তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—

"এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত—তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।"

তাঁহার এই আশংকা নিতান্ত অমূলক. ইহা যদি কোন চিত্তের 'বিশেষত্ব' হয় তবে তাহা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চিত্তেরই বিশেষত্ব।

ব্রহ্মদর্শনের পর বৈদিক ঋষি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

—হে বিশ্ববাসী, তোমরা সকলে শোন, তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি॥

রবীন্দ্রনাথের মুখেও এইরূপ একটি ব্রহ্মঘোষণা উচ্চারিত হইয়াছে এবং তাহাই অতঃপর প্রমাণ হিসাবে বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইতেছে।

এই উপলব্ধিটির বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাইব, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন। আর, পূর্বে যে-সাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এই উপলব্ধিটির মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে কয়টি বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বর্তমান উপলব্ধিটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বা সাক্ষ্যরূপে অন্তত আমার নিকট মনে হইয়া থাকে। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের এই ব্রহ্মোপলব্ধিটির অপেক্ষাকৃত একটু বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মদর্শনের পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে উদাত্ত ঘোষণা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা এই—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে।

অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।

ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিতে দেখা যায় যে, তিনটি দর্শনের কথা রহিয়াছে—

তিনি ভূমাকে দেখিয়াছেন, অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ানকে দেখিয়াছেন এবং দেহের যবনিকার আড়ালে দীপ্তিময়ী শিখাকে দেখিয়াছেন।

এই তিনটি দর্শনে তিনি ব্রহ্মকেই দেখিয়াছেন কিনা, ইহাই হইবে আমাদের প্রধান বিচার্য। আর এই তিনটি দর্শনের আড়ালে কি এবং কোন্ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাই হইবে আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাটির পৃথক কোন আলোচনার আবশ্যক করিবে না, মূল বিচার্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সাধনার পরিচয়ও স্বতই আসিয়া পড়িবে।

তিনি ভূমাকে দেখিয়াছেন, তিনটি দর্শনের মধ্যে প্রথমে এই দেখা বা উপলব্ধিকেই গ্রহণ করা যাইতেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন হইবে, কে এই ভূমা, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন?

ভূমা শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল মহান (ভূমা—বহু+ইমন্ = মহান)। উপনিষদে ব্রহ্মেরই (ব্রহ্ম-শব্দেরও অভিধানিক অর্থ বৃহৎ) এক নাম বলা হইয়াছে ভূমা। প্রসিদ্ধ ছান্দোগ্য-উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে এই ভূমাতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মজিজ্ঞাসু নারদকে সনৎকুমার ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখং ভূমৈব সুখং"—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখ॥

অতঃপর এই ভূমার পরিচয়ে ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছেন, "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্প তন্মর্ত্যং"— যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প তাহাই মরণশীল॥

উপদেশের উপসংহার করিয়া সনৎকুমার বলিয়াছেন, "স বা এষ এবং পশ্যান্ ......আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দং স্ব স্বরাড়্ ভবতি"—

এই ভূমাকে যিনি এই প্রকারে দর্শন করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্ম-মিথুন (আত্মাতে যাঁহার মিথুন ভাব) এবং আত্মানন্দ হন তিনি স্বরাট (স্ব+রাজ = আত্মেশ্বর, স্বাধীন, কিম্বা আপনাতে আপনি বিরাজমান) হন॥

এখানে উল্লেখ থাকে যে, আত্মাতে যাঁহার রতি, আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, সেই পুরুষকেই উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ' বলা হইয়াছে।

দেখা গেল যে ভূমা বলিতে উপনিষদ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছেন এবং ভূমাতত্ত্ব বুঝাইতে ব্রহ্মতত্ত্বই বুঝাইয়াছেন। কাজেই ভূমাকে দর্শন মানেই ব্রহ্মদর্শন, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তিনি ভূমারে দেখিয়াছেন। ইহার সোজা অর্থ—তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, এই স্পষ্ট ঘোষণাই রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন।

নিজের উপলব্ধি এবং তাহা স্বমুখে ঘোষণা, ইহাকে কখনো রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞতার পরিচয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যতক্ষণ না শাস্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই এখন আমাদের শাস্ত্রের একটু আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শাস্ত্রের সমর্থন সংগ্রহে প্রথমেই একটি যে সমস্যা দেখা দিবে, তাহার উল্লেখ দরকার। সমস্যাটি এই—কেহ যদি নিজ মুখে বলে যে, তাহার জিভ নাই, সে কথা বিশ্বাস করা চলে কি?

ব্রহ্মকে দেখিয়াছি, ভূমাকে দেখিয়াছি ইত্যাদি উক্তিও তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ অবিশ্বাস্য। কারণ উপনিষদ অসংখ্যবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে দেখা যায় না : ব্রহ্ম অনির্দেশ্য নির্দেশের অতীত, অলক্ষ্য লক্ষণের অতীত, অবাচ্য বচনের অতীত। উপনিষদ আরও বলেন যে, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত—তিনি অবাঙ-মনস গোচর।

ব্রহ্মকে দেখা যায় না, জানা যায় না, এই বিষয়ে অসংখ্য শ্রুতি, অর্থাৎ উপনিষদের উপদেশ রহিয়াছে। কয়েকটি শ্রুতি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কঠোপনিষদ বলেন, "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্"—তাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর নহে, চক্ষুর দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা" (কঠ)—তিনি বাক্য মন চক্ষু কিছুরই প্রাপ্য নহেন॥

মুন্ডকোপনিষদ বলেন, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে......"—তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, ইত্যাদি॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ বলেন, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্য ও মন যাঁহার নাগাল না পাইয়া ফিরিয়া আসে॥

কেনোপনিষদ বলেন, "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্‌গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"—সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না ; তাঁহাকে আমরা জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইবে।

উপনিষদের আদি উপদেষ্টা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বোক্ত সমস্ত উক্তিকে বা তত্ত্বকে একটি কথায় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন।

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—হে প্রিয়ে, যিনি সর্ব্বজ্ঞানের একমাত্র কর্তা, সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে।

অধিক শ্রুতির আর উদ্ধৃতির আবশ্যক করে না, যে কয়টি শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, সর্বোপনিষদেরই উপদেশ—ব্রহ্ম 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে', তাঁহার 'রূপম ন চক্ষুষা পশ্যতি'। এক কথায়—ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না, জানা যায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'ভূমারে দেখেছি'। এই সমস্যার মীমাংসা কি?

যাঁহাকে দেখা যায় না, সেই ব্রহ্মকে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তির মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে নহে, যে একটি স্বতঃবিরোধ রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তৈত্তিরীয়োপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহা।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান। ন বিভেতি কদাচন॥

"—এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে কোথাও শোনা যায়নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারে জানা যায় না, তাঁকে এমনি জানা যায় যে, আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা?"

যাঁহাকে জানা যায় না, সেই ব্রহ্মকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জানিয়েছেন? তিনি নিজে বলিয়াছেন—"ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে।"

ভূমাকে ব্রহ্মকে সত্যই ধ্যানচোখে দেখা যায় কিনা, তাহাই অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

ভূমাতত্ত্ব যে ছন্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই উপনিষদেই দেখা

যায়, বলা হইয়াছে, 'মনো ইমাং দৈবং চক্ষুং'—মন এই সাধকের দৈবচক্ষু।

এখানে স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে যে, চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় ছাড়া মনরূপ এক দৈব চক্ষু আছে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায়। ছান্দোগ্য যাহাকে দৈবচক্ষু বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলিয়াছেন—ধ্যানচক্ষু।

অপরাপর উপনিষদেও এই একই উপদেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; যাঁহাকে দেখা যায় না, সেই ব্রহ্মকেই দেখার জানার কথা বা উপদেশ আছে। প্রাচীনতম উপনিষদই বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী।"

এখানে ব্রহ্মকে দর্শনেরই স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে এবং তাহার জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের আবশ্যক, ইহাও বলা হইয়াছে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মদর্শনের জন্য 'নিদিধ্যাসন' বলিয়াছেন, তাহারই অন্য নাম ধ্যান এবং তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ধ্যানচক্ষু বা ধ্যানদৃষ্টি।

প্রত্যেক উপনিষদেই উপদেশ রহিয়াছে যে, ব্রহ্ম কখনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না। আবার প্রত্যেক উপনিষদেই ব্রহ্মকে দর্শনের উপদেশ আছে দেখা যায়। কয়েকটি শ্রুতি উদ্ধৃত হইতেছে, যেখানে দেখা শব্দটিই উপনিষদের ঋষি প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

মুণ্ডকোপনিষদ বলেন, "যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ"—যাঁহাকে শুদ্ধচিত্ত সাধকগণ দর্শন করেন।

"তং পশ্যতে নিষ্কল ধ্যায়মানঃ"—সেই ব্রহ্মকে ধ্যানিগণ দর্শন করেন।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ প্রকাশমান ব্রহ্মকে ধীর ব্যক্তিগণ বিশেষ দৃষ্টিতে দর্শন করেন ইত্যাদি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলেন "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন"—ঋষিগণ তাঁহাকে ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন।

"তমাত্মস্থং পশ্যতি বীতশোক"—সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া বীতশোক হন।

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ"—নিজের আত্মাতেই ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করেন ইত্যাদি ॥

কঠোপনিষদ বলেন—

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

—এই ব্রহ্ম সর্বভূতের মধ্যে গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট, তিনি প্রকাশিত নহেন ; সূক্ষ্ম-দর্শিগণই সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে পান॥

উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহে দেখা যায় যে, উপনিষদ যেখানেই ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়াছেন, সেখানেই ধ্যানযোগ, অধ্যাত্মযোগ, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির উপদেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য উপলব্ধিতেও এই কথাই আমরা দেখিতে পাই, তিনিও বলিয়াছেন—"ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।"

কাজেই ধ্যানচোখ বা ধ্যানদৃষ্টির সামান্য একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই বিশ্লেষণেই দেখা যাইবে যে, ধ্যানচক্ষু বা ধ্যানদৃষ্টির পশ্চাতে কি এবং কতখানি পূর্বসাধনা নিহিত থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যক্তিগত সাধনা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে হইলে এই বিশ্লেষণটুকুকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই।

ধ্যান শব্দটি যোগের একটি বিশেষ পরিভাষা। কৌতূহলী পাঠক মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' পাঠ করিলে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিতে পারিবেন। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন বর্তমান ক্ষেত্রে নাই।

সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, যোগ বলিতে সমাধিকে বুঝাইয়া থাকে ; আর ধ্যানেরই প্রগাঢ় অবস্থার নাম সমাধি। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষই সমাধিবান পুরুষ।

সহজ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্র যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, ইচ্ছামাত্র মন যাঁহার একাগ্র বা নিরুদ্ধ হয়, তিনিই প্রকৃত ধ্যানীপুরুষ। এই পুরুষেরই মনের একাগ্র বা নিরুদ্ধভূমিতে যে-দৃষ্টি থাকে, তাহারই নাম ধ্যানচক্ষু বা ধ্যানদৃষ্টি।

চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তের নিরোধশক্তি দীর্ঘ সাধনা ও অভ্যাসের পরেই ক্রমে ক্রমে লব্ধ হয়। তাহার পরেই এই ধ্যানদৃষ্টি বা ধ্যানচক্ষু সিদ্ধসাধকের স্বভাবে বা স্বাভাবিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। দেহ-মন-বুদ্ধির বহু বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ ইত্যাদি দীর্ঘসাধনায় পার হইয়া তবে ধ্যানভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। সেই ভূমির পুরুষেরই স্বাভাবিক অথচ বিশেষ দৃষ্টির নাম ধ্যানচক্ষু। মনের সেই একাগ্র বা নিরুদ্ধ ভূমিতে যিনি চক্ষু মেলিতে পারেন, তাঁহার দৃষ্টিতেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

সাধারণের বোধগম্য করিয়া এককথায় বলা চলে যে, ইচ্ছামাত্র যে পুরুষ নিজের ভিতরকার সুষুপ্ত অবস্থাটিতে পৌঁছিতে পারেন এবং সেই গভীর ও প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যেও আপন চেতনাকে জাগ্রত অবস্থার ন্যায় সজাগ রাখিতে পারেন, তিনিই

ধ্যানী পুরুষ। তাঁহার সেই ধ্যানচক্ষু নিজের ভিতরকার সেই সুষুপ্তির অন্ধকার ভেদ করিয়া "তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে" দেখিতে পায়, যাঁহাকে উপনিষদ নাম দিয়াছেন ব্রহ্ম। এই পুরুষই বলিতে পারেন—"ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে।"

যতটুকু বিশ্লেষণ করা হইল, তাহাতেই এইটুকু জানা যায় যে, ঘুমে বা মৃত্যুতে এই চোখ বন্ধ হইবার পরও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যে দৃষ্টি খোলা থাকে, তাহারই নাম ধ্যানচক্ষু। এই ধ্যানচক্ষু সাধনসিদ্ধ পুরুষেরই শুধু লব্ধ বা লভ্য হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীরই পুরুষ, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন "ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।"

"ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিশ্বাস ও প্রত্যয় উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে-কেহই বলিতে পারেন যে, তিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন, সে-কথা বিশ্বাস করা বা না করা শ্রোতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমি ব্রহ্মকে দেখিয়াছি, এই উক্তির মধ্যে ব্রহ্ম-দর্শনের কোন রূপ-রস-আস্বাদন কিছুই নাই, কাজেই ইহা শ্রোতার বিশ্বাস বা চেতনা কোনটাকেই স্পর্শ করে না। ব্রহ্মদর্শনের ঘোষণায় সেই দর্শনের অন্ততঃ কিছু পরিচয় ব্যক্ত হওয়া উচিৎ, যাহাতে শ্রোতার মনেও একটি আধ্যাত্মিক স্পন্দন কিম্বা অপরূপ ঢেউ লাগিতে পারে।

বস্তুত উপনিষদের কোন ঋষিই "বেদাহমেতং—তাঁহাকে জানিয়াছি" বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্ম-ঘোষণা শেষ করেন নাই তাঁহাদের ঘোষণায় এই দর্শনের অলৌকিক রূপ-রস ইত্যাদির কিছু না কিছু আস্বাদ বা আভাস রহিয়াছে দেখা যাইবে। উপনিষদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

কোন ঋষি বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে জানিয়াছি—তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি তমসার পরপারে, তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়াছি।

কোন ঋষি বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়া—এই দেহেই অমৃত লাভ করিয়াছি।

কেহ বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছি—যিনি গূহাহিত এবং অবিদ্যা গ্রন্থি এখন ছিন্ন হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়াছি—অন্তর্হৃদয় আকাশে।

কেহ বলিয়াছেন, এই দেহপুর মধ্যে যে পদ্ম রহিয়াছে, সেই পদ্মে যে পরম দেবতা শোকহীন পাপহীন গগনসদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে জানিয়াছি।

আবার কেহ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়াছি—যিনি নীলতোয়দমধ্যস্থ বিদ্যুল্লেখার ন্যায় ভাস্বর ও অনুপম। ইত্যাদি॥

উদ্ধৃত উক্তিসমূহে দেখা যায় যে, ঋষিদের ব্রহ্ম-ঘোষণায় হয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয় ব্রহ্মদর্শনের ফল সম্বন্ধে অথবা উভয় সম্বন্ধেই কিছু না কিছু ইঙ্গিত বা বিবরণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই বিবরণকেও আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা যায়—তিনি কোথায় এবং তিনি কিরূপ।

প্রথম ভাগে ঋষিদের ঘোষণায় পাওয়া যায়—তিনি তমসার পারে, তিনি হৃদয়-আকাশে, তিনি গুহাহিত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায়—তিনি বিদ্যুল্লেখের ভাস্বর, তিনি জ্যোতির্ময় তিনি আদিত্যবর্ণ, তিনি গগনসদৃশ ইত্যাদি।

আর ঋষিদের ঘোষণায় ব্রহ্মদর্শনের ফল সম্বন্ধে পাওয়া যায়—মৃত্যুকে পার হইয়াছি, এই দেহেই অমৃত লাভ করিয়াছি, শোককে অতিক্রম করিয়া বীতশোক হইয়াছি, অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করিয়াছি, ইত্যাদি।

ঋষিদের উদ্ধৃত ব্রহ্ম-ঘোষণায় পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ের অন্তত কোন একটির পরিচয় বা বিবরণ সর্বদাই পাওয়া যায়, দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কোথায় ব্রহ্ম কিরূপ এবং ব্রহ্মদর্শনের ফল কি—এই তিনটির কোন না কোন একটির বিবরণ ঋষিদের ব্রহ্মদর্শনের প্রসঙ্গে উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক ও সংগত। যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হইলে 'ব্রহ্মকে দেখিয়াছি' বলিয়া সে উপলব্ধির বিবরণ শেষ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে, স্বাভাবিকও নহে।

এই কারণে রবীন্দ্রনাথও 'ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে' বলিয়া তাঁহার উপলব্ধির বিবরণ শেষ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি বলিয়াছেন—"ভূমারে দেখেছি ধ্যান-চোখে আলোকের অতীত আলোকে।"

কোথায় তিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরই 'আলোকের অতীত আলোকে'—অংশটুকুতে প্রদত্ত রহিয়াছে। 'আলোকের অতীত আলোকে,' ইহার মধ্যেই ব্রহ্মদর্শনের যথার্থ পরিচয়টুকু পাওয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঘোষণায় আমরা ব্রহ্মকে পাই—'আলোকের অতীত আলোকে.' আর বৈদিক ঋষির ঘোষণায় ব্রহ্মকে পাই—'তমসঃ পরস্তাৎ'। উভয় ঘোষণা একই

অর্থ বহন এবং একই সত্য নির্দেশ করিয়া থাকে।

'আলোকের অতীত আলোক,' ইহা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কোন্ লোক বা স্থান, অথবা কোন্ আলোকের নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন?

উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম সর্বস্থানে এবং সর্বকালে থাকিয়াও স্থান ও কালের অতীত। সে কোন্ স্থান?

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট জনককে ব্রহ্মোপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

যস্মাদর্বাক্ সংবৎকরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম॥

—যাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া সম্বৎসর দিবসের সহিত আবর্তিত হয়, দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন॥

যাঁহাকে কাল স্পর্শ করে না, তিনি শুধু কালাতীতই নহেন, তিনি কালের ন্যায় স্থানেরও অনবচ্ছিন্ন এবং তিনিই ব্রহ্ম এবং তাঁহাকেই ঋষি যাজ্ঞলল্ক্য 'জ্যোতিষাং জ্যোতি' বলিয়াছেন।

আর রবীন্দ্রনাথ সেই 'জ্যোতিষাং জ্যোতি'-কেই বলিয়াছেন—"আলোকের অতীত আলোক।"

মুন্ডকোপনিষদেও অনুরূপ একটি শ্লোক রহিয়াছে—

হিরন্ময়ে পরেকোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥

—জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশমধ্যে (হৃদয়-কোশে) বিরজ (দোষহীন) নিষ্কল (নিরবয়ব) যে ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুভ্র (শুদ্ধ) এবং তেজোময় পদার্থসমূহেরও অবভাসক, যাঁহারা আত্মজ্ঞানী তাঁহারাইমাত্র তাঁহাকে জানেন॥

এখানেও ব্রহ্মকে জ্যোতিষাং জ্যোতি, আলোর আলোক বলা হইয়াছে। কিন্তু এ আলো কোথায়?

সে স্থানের বর্ণনায় উপনিষদ বলিয়াছেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেবভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

—সেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি নাই, বিদ্যুৎও সেখানে প্রভান্বিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ প্রকাশমান, তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশ পায়॥

অর্থাৎ সে-স্থান কালাতীত, স্থানাতীত, সেখানে তাই সূর্যাদির আলো পৌঁছিতে পারে না, উপনিষদ ইহাই উক্ত স্থান সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন। সেই স্থানটিকেই বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষাং জ্যোতি, অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত জ্যোতিপদার্থ তাঁহারই বা সেই স্থানেরই ছায়ামাত্র।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সে-লোক বা স্থানকে বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ সে-স্থান এবং ব্রহ্ম একই ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই একই কথা বলিয়াছেন—সেই ভূমাকে আমি দেখিয়াছি যিনি আলোকের অতীত আলোক, সেই ব্রহ্মকে আমি দেখিয়াছি যিনি আলোকের অতীত আলোকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্বটিই যোগবাশিষ্ঠে অতি মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

অচন্দ্রার্কাগ্নিতায়োঽপি কোঽবিশাশঃ প্রকাশকঃ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাৎচ প্রকাশঃ সম্প্রবর্তীত॥

—কে চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্যমান, কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক॥

তিনিই উপনিষদের "জ্যোতিষাং জ্যোতি" এবং রবীন্দ্রনাথের "আলোকের অতীত আলোক।"

সূর্যের আলোকে প্রকাশিত বস্তুজগতকে দেখিবার জন্য যেমন চক্ষুর দরকার, সেই জ্যোতিষাং জ্যোতি আলোকের অতীত আলোকে দেখিবার জন্যও নিশ্চয় তেমনি চক্ষুর দরকার। উপনিষদ বলেন যে, এই চক্ষুতে তাঁহাকে দেখা যায় না, তাহার জন্য 'দৈব চক্ষু' দরকার। রবীন্দ্রনাথও তাই বলিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তিনি ধ্যানচক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন আমরা নিঃসন্দেহে অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি যে, "ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে," রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণায় প্রমাণিত হয়—তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে।

এখন আমরা আরও বলিতে পারি যে, 'ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে,' আর 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—একই ব্রহ্মদর্শন এবং একই ব্রহ্মঘোষণা। উভয়ের পার্থক্য বা ব্যবধান শুধু কালের—একটি ঘোষণা প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষির, অপরটি বর্তমান ভারতের নূতন ঋষির।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দর্শনটিতে আসা যাইতেছে। দর্শনটি এই--

"অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়েছি সন্ধান॥"

যাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি কে? তিনিই ব্রহ্ম। 'অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান'—ইহা ব্রহ্মেরই বিবরণ বা পরিচয়। এই পরিচয় বা বিবরণ উপনিষদ হইতেই আক্ষরিকভাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইবে।

কঠ, শ্বেতাশ্বতর এবং মহানারায়ণ এই তিনখানি উপনিষদেই নিম্নোক্ত শ্লোকটি পরিদৃষ্ট হয়—

অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

—অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান এই ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন॥

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত মন্ত্রের প্রথম ছত্রটিই রবীন্দ্রনাথ একেবারে আক্ষরিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তাঁহারই সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, ইহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মকেই যে তিনি বুঝাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে

সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এখানে হয়তো অনেকের মনে হইতে পারে যে, একই ব্রহ্ম অণু হইতে অণু এবং মহৎ হইতে মহৎ কি প্রকারে হন। কেমন করিয়া হন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা শুধু জানি যে. উপনিষদের মতে ইহাই ব্রহ্মের পরিচয় এবং সে-পরিচয় আমাদের যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না।

তাঁহা ছাড়া. উত্থাপিত প্রশ্নটি হইল আসলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা. আর ব্রহ্মবিচার আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ নহে। উপনিষদের ঋষিগণ একই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একই সঙ্গে বিরুদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ বলিয়া আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

উদ্ধৃত মন্ত্রটির ন্যায় অন্যান্য উপনিষদেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি বা উপদেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুন্ডকোপনিষদ বলেন. এষোহণুরাত্মা।

শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ বলেন. আরাগ্রমাত্রোহ্যপরোহপি দৃষ্টঃ। এখানে ব্রহ্মকে 'আরাগ্র-মাত্রঃ' গরু-চরাইবার পাচনির অগ্রভাগে সূচীমুখের ন্যায় সূক্ষ্ম-পরিমাণ বলা হইয়াছে।

এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেই অন্যত্র একই শ্লোক ব্রহ্মকে "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং বিশ্বস্য স্রষ্টারম্" সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্বস্রষ্টা এবং "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং" বিশ্বের অন্তর-বাহিরে অদ্বিতীয় পরিব্যাপক বা পরিব্যাপ্তা বলা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শান্ডিল্য-বিদ্যা অধিকরণে "এষো ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" এই ব্রহ্মই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে, ইহা বলিয়া তাঁহাকে "অণীয়ান ব্রীহেং বা যবাৎ বা......ব্রীহি যব সর্ষপ ইত্যাদি অপেক্ষাও অণু"—রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৎপরেই পূর্ব্ববৎ "এই ব্রহ্মই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে" বলিয়া তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন—"জ্যায়ান পৃথিব্যা......ইনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ. এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান॥"

হৃদয়ে অবস্থিত একই ব্রহ্মকে একই সময়ে 'অণীয়ান' এবং 'জ্যায়ান' এই দুই বিরুদ্ধ বিশেষণে উপনিষদ বিশেষিত করিয়াছেন দেখা যায়। কাজেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' এই পরিচয় মানিয়া লওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।

প্রসঙ্গত সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে. ব্রহ্ম সমস্ত

বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় এবং যাহা কিছু বিরোধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে মাত্র, বিরুদ্ধ ধর্ম বা বিরুদ্ধ বিশেষণ ব্রহ্মের কোন ইতর-বিশেষ ঘটায় না। এককথায়, তিনি স্বয়ং সমস্ত কিছুকেই স্পর্শ করিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।

আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে—'অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছেন, এ বিষয়ে প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই এবং তাঁহারই সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথ জানাইতে চাহিয়াছেন, এই বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

কিন্তু এইরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও আলোচ্য প্রসঙ্গে স্বয়ং বক্তার মুখের কথার উপর আমরা পূর্বে নির্ভর না করিয়া ব্রহ্মদর্শনের প্রমাণই চাহিয়াছি। এক্ষেত্রেও তাই জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যে 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'-কেই দেখিয়াছেন, তাহার কিছু প্রমাণ তিনি দিয়াছেন কি ?

সেই প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তাঁহার এই উক্তিতে—"ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়েছি সন্ধান।"

ইহা প্রমাণ কিনা, তাহাই এখন আমাদের বিচার্য। কোথায় তিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন, ইহা তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রমাণ-পথটি অনুসরণ করিলে ব্রহ্মেরই সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, এইটুকু শুধু এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ, 'ইন্দ্রিয়ের পারে' বলিতে গন্তব্য ব্রহ্মে গিয়াই শেষ হয় কিনা, ইহাই আমাদের বিচার্য।

বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, 'তমসার পারে' তিনি ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়েছি সন্ধান'।

এখন প্রশ্ন, 'তমসার পার' এবং 'ইন্দ্রিয়ের পারে' কি একই ব্যাপার ?

বাহ্যত তাহা মনে হয় না, কারণ তমসা এবং ইন্দ্রিয় কোনক্রমেই এক অর্থ অর্থ বহন করে না। কাজেই 'তমসার পার' এবং 'ইন্দ্রিয়ের পার' একই ব্যাপার, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গলদঘর্ম হইবার দরকার নাই। আমরা আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও যুক্তির পথ প্রথমে একটু অনুসরণ করিতে পারি এবং সে-পথে 'ইন্দ্রিয়ের পার'-এর নাগাল অর্থাৎ অর্থ পাওয়া দুর্লভ নাও হইতে পারে।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের একটামাত্র দিকই আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইল বিষয়ের দিক। ইন্দ্রিয়ের এই দিকে গিয়া তো কোন পারই পাওয়া যায় না। চক্ষু চিরকালই রূপ দেখিবে, অনন্তকাল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেও চক্ষু দিয়া

কখনো রূপকে উত্তীর্ণ হইয়া কোন পারের নাগাল মিলিবে না। চক্ষুর সাধ্য নাই রূপকে সাঁতরাইয়া পার হয়,—এ যেন অসীম অকূল পাথার। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সম্বন্ধেও এই একই কথা সমান প্রযোজ্য।

দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয়ের এদিকে অনন্তকাল অগ্রসর হইলেও 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিয়া কোন কিছুরই নাগাল পাওয়া যাইবে না। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জগৎ এমনই একটি 'মহা-বৃত্ত' যাহার পরিধি অসীম কালে এবং অসীম আকাশে বিস্তারিত। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের কথিত 'ইন্দ্রিয়ের পার' এই পরিধির দিকে নয়।

আর, যদি রবীন্দ্রনাথ 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিতে বস্তুত ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রকাশিত ও বিস্তারিত এই জগৎকেই বুঝাইয়া থাকেন, তবে ইন্দ্রিয়বান ব্যক্তিমাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত হইতে বাধ্য। কারণ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সে-জগৎ সকলেরই ইন্দ্রিয়-গোচর।

তাহা ছাড়া, জগৎকে আমরা জগৎরূপেই দেখিতে পাই, সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'-কে আমরা কেহই দেখিতে পাই না। এইদিকেই যদি 'ইন্দ্রিয়ের পার' হইত, তবে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আমরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কথিত 'ইন্দ্রিয়ের পার' এই প্রকাশিত জগৎ-দৃশ্য হইতে পারে না।

কিম্বা 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিতে যদি রূপ-রস-গন্ধাদির আড়ালে কোন-কিছুকে রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া থাকেন, তবে সে কথার কোন অর্থ হয় না। চক্ষুর কথাই ধরা যাক,—চক্ষুর সম্মুখেই রূপের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই রূপ হইতে রূপে যাহা রূপান্তরিত হয় রূপের অন্তরের সেই 'যাহাই' যদি 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া থাকেন, তবে পূর্বের সমস্যাই দেখা দিবে। অর্থাৎ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রকাশিত অংশটুকুই দেখে, তাহার আড়ালে যদি কোন 'পার' থাকিয়াও থাকে, তাহা দেখে না।

উপরন্তু এই ক্ষেত্রে 'ইন্দ্রিয়ের পার' না বলিয়া 'সৃষ্টির পারে' বা 'সৃষ্টির অতীত' অথবা 'সৃষ্টির অন্তরে' ইত্যাদি প্রয়োগই সমধিক সত্য ও যথার্থ হইত। কিন্তু তাহাতে বড় জোর একটা 'তত্ত্ব' প্রকাশ পাইত, 'সত্যদর্শন' প্রকাশ পাইত না। কাজেই 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিতে সৃষ্টি বা জগতের দিকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় নির্দেশ করেন নাই, বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়ের একটামাত্র দিকই আমরা জানি, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়কে বলা যাইতে পারে—দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মাঝে সংযোগসেতু। সেতুর যে-মুখটা

দৃশ্যের দিকে, সে-দিকে 'ইন্দ্রিয়ের পারে' পাওয়া যায় নাই। সেতুর যে-মুখটা দ্রষ্টার দিকে, সে-পথে হয়তো 'ইন্দ্রিয়ের পার' পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। কাজেই সেতুর এই দিকটার একটু খোঁজ লওয়া যাইতেছে।

কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার কর্তাকে বা দ্রষ্টাকে দেখে না, যদিও ইন্দ্রিয় কর্তারই নিজস্ব শক্তি। ইন্দ্রিয়ের এই পারটা চিরকালই অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয়। আর, একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার যে, ইন্দ্রিয়ের যে সেতু-মুখ দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ, তাহা কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে চির-লগ্ন নহে ; অর্থাৎ, নিদ্রা-মূর্ছা ইত্যাদি অবস্থায় দৃশ্য হইতে ইন্দ্রিয়ের সেতুমুখ উত্তোলিত বা বিযুক্ত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা হইতে দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কখনো বিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ শক্তি কখনো শক্তিমানকে বা তাহার আশ্রয়কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

দৃশ্যের দিকে 'ইন্দ্রিয়ের পার' পাওয়া যায় নাই, কাজেই দ্রষ্টার দিকেই 'ইন্দ্রিয়ের পার' পাওয়া যাইবে, যদি রবীন্দ্রনাথের কথিত কোন 'পার' আদৌ থাকে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিতে এদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহা ধরিয়া লইয়া এখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ইন্দ্রিয়ের এ-মুখে কাহাকে পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয়ের কর্তাকে বা দ্রষ্টাকে, বা সাক্ষীকে। আর, আসল দ্রষ্টা বা সাক্ষী বলিতে আত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে এবং সেই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাই উপনিষদের উপদেশ। 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'—রূপে ব্রহ্মেরই সন্ধান রবীন্দ্রনাথ 'ইন্দ্রিয়ের পারে' পাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের এইদিকেই যখন ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তখন 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিতে রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টার দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহাই এখন সিদ্ধান্ত।

উপনিষদে এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যাইবে। কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়াছেন, সেইজন্য জীবগণ বহির্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব-অভিলাষে 'আবৃত-চক্ষু' হইয়া আত্মাকে দর্শন করে॥"

এখানে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবে বহির্মুখ এবং বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না।

আর বলা হইয়াছে যে, ধীর বিবেকী ব্যক্তি, 'আবৃতচক্ষু' হইয়া অর্থাৎ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া তবে ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

উপনিষদ যাহাকে 'আবৃত-চক্ষু' বলিয়াছেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কথিত 'ইন্দ্রিয়ের পারে' যাইবার পথ।

প্রশ্নোপনিষদেও দেখা যায় যে, মহর্ষি পিপ্পলাদ শিষ্য ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তরে এই একই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥

—রথচক্রের নাভিরন্ধ্রে সংস্থিত অর (শলাকা)-সমূহের ন্যায় উক্ত কলাসমূহ (পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন = ষোড়শ কলা) যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই বেদিতব্য পুরুষকে অবশ্যই জানিবে—যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে॥

ইহার পরেই মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন, "এতাবদেবাহমেতং পরং ব্রহ্মবেদ। নাতঃ পরমস্তীতি"—আমি এই পরব্রহ্মকে এই পর্যন্তই জানি। ইহার অতিরিক্ত আর (ব্রহ্মতত্ত্ব) নাই॥

এখানে এই কয়টি কথা বলা হইয়াছে, যথা—রথের চাকার শলাকাসমূহ যেমন চাকার নাভিরন্ধ্রে সংযুক্ত, ইন্দ্রিয়সমূহও তেমনি পুরুষে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত। সেই পুরুষই একমাত্র বেদিতব্য। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু আর স্পর্শ করে না ; তিনিই পরব্রহ্ম, তাহার পরে বা অতিরিক্ত আর কিছু নাই॥

রথের চাকার শলাকার এক মুখ পরিধির দিকে, ইন্দ্রিয়েরও এক মুখ বিষয়-পরিধির দিকে। রথের চাকার শলাকার অন্য মুখ চাকার কেন্দ্রে নাভিরন্ধ্রে সংযুক্ত, ইন্দ্রিয়েরও অপর মুখ ইন্দ্রিয়ের কর্তা-পুরুষের সঙ্গে যুক্ত। 'ইন্দ্রিয়ের পারে' বলিতে রবীন্দ্রনাথও এই কেন্দ্রের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই কেন্দ্রকেই মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম।

রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ের পারে" অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ানকে তিনি দেখিয়াছেন। আর 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্' যে ব্রহ্ম, তাহা পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি।—এখন আমরাও নিশ্চয় ঘোষণা করিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

'ইন্দ্রিয়ের পারে' যাইবার জন্য উপনিষদ 'আবৃত চক্ষু' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্বক অন্তর-কেন্দ্রে লগ্ন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের এই 'প্রত্যাহারই' পরে ধ্যানে পরিণত হয় এবং এই ধ্যানী পুরুষকেই

উপনিষদ এখানে 'আবৃতচক্ষু' বলিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই পূর্বে বলিয়াছেন 'ধ্যানচক্ষু' আর এখানে বলিয়াছেন 'ইন্দ্রিয়ের পার'।

কিন্তু এই 'ইন্দ্রিয়ের পার'-পাওয়া অনায়াস বা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, ইহা বহু সাধনাসাপেক্ষ। 'ইন্দ্রিয়ের পারে' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে কোন সাধনার ইঙ্গিত করিয়া থাকে, 'ধ্যানচক্ষুর' বিশ্লেশণে তাহা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি বাহুল্য এবং অনাবশ্যক।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য উপলব্ধির তৃতীয়-দর্শনটিকে গ্রহণ করা যাইতেছে। এই তৃতীয়-দর্শনে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—

"ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥"

পূর্বের দুইটি দর্শন হইতে এই তৃতীয়-দর্শনটি অপেক্ষাকৃত একটু দুর্বোধ্য মনে হইবে। প্রথম দুইটি দর্শনে যে তিনি ব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ও আক্ষরিকভাবে উপনিষদের ব্রহ্মবাচক 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' এবং 'ভূমা' শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন।

কিন্তু 'দীপ্তিময়ী শিখা' বলিতে স্বভাবতই ব্রহ্মকে বুঝায় না, বুঝায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাকে। কাজেই এই তৃতীয় দর্শনে রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুত ব্রহ্মকেই দেখিয়াছেন, ইহা বুঝানো এবং প্রমাণ করা একটু কষ্টকর হইবে বলিয়াই মনে হয়। কষ্টসাধ্য হইলেও চেষ্টা করিতে হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রে 'ধূমাৎ বহ্নিমান পর্বত' অনুমান করিবার বিধি আছে এবং সে-অনুমান প্রমাণ বলিয়াই পন্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে। তেমনি দেহের তাপ দেখিয়া দেহমধ্যস্থ অগ্নির অবস্থিতিও আমরা অনুমান এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের শরীরের মধ্যে যে আগুন আছে, 'জঠরাগ্নি', 'মন্দাগ্নি' ইত্যাদি প্রয়োগ হইতেও প্রমাণিত হয়।

দেহস্থ এই অগ্নিই ব্রহ্ম কি না, তাহা পরে বিচার্য। আপাতত এইটুকু

স্বীকৃত হইল যে, শরীরের মধ্যে আগুন আছে, শরীরের তাপই তাহার প্রমাণ, কারণ তাপ কখনো অগ্নিকে ছাড়া বা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে আছে—

"হে বরুণ! তোমারই যে তেজ ও শক্তি সমুদ্র-সলিলে বাড়বাগ্নি, তাহাই অন্তরীক্ষে সূর্যাগ্নি, প্রাণি-জঠরে জঠরাগ্নি, মেঘমন্ডলে বিদ্যুদগ্নি এবং রণভূমিতে তাহাই বীরের হৃদয়ে শৌর্যাগ্নিরূপে অবস্থিত॥"

যে চৈতন্যময়ী মহাশক্তি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে অবস্থিত ও ক্রিয়াশীল, তাহাকেই এখানে বৈদিক-ঋষি তেজ বা অগ্নিরূপে অভিহিত করিয়াছেন. ভূমিকা হিসাবে এই সত্যটুকুর ইঙ্গিত করিয়া রাখা গেল।

দেহের তাপ হইতে দেহস্থ অগ্নির আমরা অনুমান করিয়াছি। কিন্তু দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া কোন ডাক্তারই কণামাত্র অগ্নিরও সাক্ষাৎ পাইবেন না। কিন্তু এ কোন্ আগুন যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহার তাপ পাওয়া যায়?

এ প্রশ্নের উত্তরও এখন থাক; বরং অন্য একটি প্রশ্ন গ্রহণ করা যাক—শরীরের এই অগ্নি কোথায় থাকে. যাহা দেহে তাপরূপে এবং জঠরে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাচক জঠরাগ্নিরূপে ক্রিয়াশীল? এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তারী-শাস্ত্রে নাই, অন্যত্র ইহার অন্বেষণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের একটি সূত্র এই—

"অস্যেব চোপপত্তেরূষ্মা", তস্যার্থঃ সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয়; কারণ সূক্ষ্মশরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মা দৃষ্ট হয় না॥

ভগবান বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রটি হইতে অন্তত এইটুকু প্রতিপন্ন হয় যে. স্থূলদেহের উত্তাপ তাহার নিজের নহে. তাহা সূক্ষ্মদেহের। কাজেই আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মসূত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, শরীরের যে আগুন আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা এই দেহে নাই, তাহা আছে শরীরের মধ্যস্থ সূক্ষ্মদেহে। স্থূলদেহে সে আগুন নাই বলিয়াই শরীর চিরিয়াও কোন ডাক্তার তাহাকে দেখিতে পান না; স্থূলদেহে সে-আগুন থাকিলে আমরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে দেখিতে পাইতাম।

রবীন্দ্রনাথ কেন যে 'দেহের যবনিকা'-বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত যেন এখন কতকটা স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'দেহের যবনিকা ভেদ' করিয়াই তবে 'দীপ্তিময়ী শিখাকে' দেখিতে

পাইয়াছেন, আর সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম হইলেও দেহ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা' সূক্ষ্ম শরীরেও নাই, তাহা অন্যত্র, এইটুকু অন্তত এখন অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাতঞ্জলসূত্রে বিভূতিপাদে একটি সূত্র আছে—"মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শন।"

ভগবান বেদব্যাস সূত্রটির ভাষ্য করিয়াছেন—"শিরঃ কপালেহন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতি......শিরস্থ কপালের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্যে যে ভাস্বর জ্যোতি বিদ্যমান ইত্যাদি॥"

এখানে পাওয়া গেল যে কপালের অন্তশ্ছিদ্রে দীপ্তিমান এক জ্যোতি রহিয়াছে। যোগসূত্রের সেই 'ভাস্বরজ্যোতি'-কেই কি রবীন্দ্রনাথ 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা' বলিয়াছেন ?

অনেক ভাষ্যকার অবশ্য মস্তকের অভ্যন্তরস্থ এই জ্যোতিকেই আত্মজ্যোতি বলিয়াছেন। আমরা শুধু এই তথ্যটুকুই মাত্র গ্রহণ করিয়াছি যে, যোগসূত্র এবং ভগবান বেদব্যাসের অভিমতে মস্তকের অভ্যন্তরে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্শিখা রহিয়াছে। কাজেই, দেহের যবনিকার আড়ালে রবীন্দ্রনাথ যে 'দীপ্তিময়ী শিখা' দেখার কথা বলিয়াছেন, তাহাকে এখন অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিশ্চয় চলে না। সে-জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতি কি না, সে অবশ্য পৃথক বিচার্য।

"যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য" নামক যোগগ্রন্থে আত্মস্বরূপ জানিবার জন্য যে ধ্যানের উপদেশ রহিয়াছে, তাহাঁতে বলা হইয়াছে "ভারূপমমৃতং ধ্যায়েদ ভ্রূমধ্যে"—ভ্রূযুগলের মধ্যে জ্যোতির্ময় ও অমৃতময় স্বরূপকে ধ্যান করিবে॥

এই স্থানকেই যোগের পরিভাষায় 'আজ্ঞাচক্র' বলা হয়। পাতঞ্জল-সূত্রের মূর্ধজ্যোতি এবং 'যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য'-এর আজ্ঞাচক্রের জ্যোতি একই কি না, সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর। যোগিগণের ধ্যানলব্ধ বা ধ্যানদৃষ্ট একটি 'জ্যোতি' দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, এই তথ্য বা তত্ত্বই আমাদের এখানে প্রধান জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন 'দেহের যবনিকা' ভেদ করিয়া তিনি 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ীশিখা' দেখিয়াছেন, সে-কথার সমর্থন প্রামাণ্য যোগগ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যাইতেছে।

"যোগিযাজ্ঞবল্ক্য" অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই 'দীপ্তিময়ী শিখাকেই' আত্মজ্যোতি বলিয়াছেন দেখা যাইবে—"ললাটমধ্যে যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং......ললাটমধ্যে জ্ঞানময়ী দীপবৎ সমুজ্জ্বলা প্রভা যিনি দর্শন করেন॥"

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'দীপ্তিময়ী শিখা' বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মজ্যোতি, 'যোগ-যাজ্ঞবল্ক্য'-গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ও অনুমোদন পাওয়া যায়। যথা—

অত্রি ঋষি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "এই যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, তাঁহাকে কেমনি জানিব?"

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "এষোঽনন্তোব্যক্ত আত্মা অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত॥"

সেই 'অবিমুক্ত' কোথায়?

উত্তরে মহর্ষি বলেন, "ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য যঃ সন্ধিঃ—ভ্রু এবং নাসিকার সন্ধি-স্থানই অবিমুক্ত॥"

এই স্থানেরই নাম আজ্ঞাচক্র এবং এই আজ্ঞাচক্রেই পূর্বোক্ত 'ভারূপমমৃতং—জ্যোতির্ময় অমৃতস্বরূপকে, 'জ্ঞানময়ী দীপবদুজ্জ্বলা প্রভা'-কে দর্শন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কাজেই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আজ্ঞাচক্রে ব্রহ্মজ্যোতি বা আত্মজ্যোতি দর্শনের উপদেশই দিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'দীপ্তিময়ী শিখা' আর এই আজ্ঞাচক্রের আত্মজ্যোতি যদি এক হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে ব্রহ্মদর্শন বলিয়া স্বীকার না করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদেও একটি মন্ত্র আছে—

"ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ললাটের যে একদেশস্থান তাহাই অমৃতস্থান (ব্রহ্মস্থান)। ঐ স্থানই বিশ্বের মহান আধারস্বরূপ—অমৃতস্থানং বিজানীয়াদ্বিস্যায়তনং মহৎ॥" অর্থাৎ, এই স্থান বা এই জ্যোতি, অথবা এই লোক বা আলোক-ই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আশ্রয়। আর ব্রহ্মই যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র আশ্রয়, ইহাই সর্বোপনিষদের উপদেশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, এখানে যে স্থানকে 'অমৃতস্থান' এবং 'বিশ্বস্যায়তনং মহৎ' বলা হইয়াছে, প্রসিদ্ধ মান্ডূক্য উপনিষদে 'সুষুপ্তিস্থান' সম্বন্ধেই সেই উপদেশ পাওয়া যায়,—

"সুষুপ্তিস্থানই (সুষুপ্তি যাঁহার স্থান).... প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম—স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতবর্গের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান॥"

কাজেই এখন বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'দীপ্তিময়ী শিখা', যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট 'জ্ঞানময়ীপ্রভা' এবং মান্ডূক্য উপনিষদের সুষুপ্তি-স্থান-পুরুষ একই সত্যের বা তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের এই তৃতীয়-দর্শনটি, যেখানে তিনি বলিয়াছেন, 'ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা',—ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এতক্ষণ যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে এইটুকুই মাত্র প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় শিখা বা জ্যোতি রহিয়াছে এবং সেই জ্যোতিকেই যোগশাস্ত্রসমূহ ব্রহ্ম বা আত্মজ্যোতি বলিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'দীপ্তিময়ী শিখাই' যে সেই ব্রহ্মজ্যোতি, তাহা ঠিক সাক্ষাৎভাবে আমরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে আমরা এতাবৎ প্রায় একান্তভাবে উপনিষদেরই আশ্রয় ও সাহায্য লইয়াছি। এক্ষেত্রেও উপনিষদের সাহায্য যথাস্থানে গৃহীত হইবে। তাহার পূর্বে অপরাপর অধ্যাত্মশাস্ত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কথিত এই 'দীপ্তিময়ী শিখা' সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তাহারই কিছু প্রচেষ্টা করা গিয়াছে এবং আরও একটু করা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'দীপ্তিময়ী শিখা'ই আত্মা বা আত্মজ্যোতি, মহাভারতের সাহায্যে তাহাই এখন আমরা প্রমাণের প্রচেষ্টা করিতেছি।

মহাভারতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার একস্থানে মহর্ষি বলিয়াছেন—"যোগে উত্তমরূপে নৈপুণ্য জন্মিলে (অর্থাৎ সমাধি-সিদ্ধ হইলে) গাঢ়তর অন্ধকারে অবস্থিত জ্বলনতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হয়॥"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এখানে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-'জ্বলনতুল্য'-রূপে যোগদৃষ্টিতে বা ধ্যানচক্ষুতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাই বলিয়াছেন—অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখারূপীকে তিনি দেখিয়াছেন।

মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে যে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহার কিছু বিবরণ মহাভারতে রক্ষিত রহিয়াছে। তাহার একস্থানে মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন—"শরীরের মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান, তাহাকেই জীবাত্মা বলা যায়॥"

রবীন্দ্রনাথও দেহমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান অনির্বাণ জ্যোতিশিখাই দেখিয়াছেন। মহর্ষি ভৃগুর অভিমতে ইহাকেই আত্মদর্শন বলিয়া আমরা নিশ্চয় গ্রহণ করিতে পারি।

ভগবান বেদব্যাস স্বপুত্র শুকদেবকে যে দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার একস্থানে তিনি শুকদেবকে এই কয়টি কথা বলিয়াছেন—"মন ইন্দ্রিয়াদির সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী সেই তেজঃস্বরূপ সর্বব্যাপী

পরমব্রহ্মকে ধূমহীন প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখার ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন ॥"

বেদব্যাস দেহমধ্যস্থ ব্রহ্মজ্যোতিকে বলিয়াছেন, "ধূমহীন প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখা," আর রবীন্দ্রনাথ দেহমধ্যস্থ সেই জ্যোতিকেই বলিয়াছেন, "অনির্বাণ দীপ্তি-ময়ী শিখা।"—উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যক করে না।

এই একই উপদেশ ব্যাসদেব অন্যত্র বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মবিদ মহাত্মারাই সেই সর্বব্যাপী বিধূম পাবকের ন্যায় পরমব্রহ্মকে দর্শন করেন ॥"

পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে যে, ব্যাসদেবের 'ধূমহীন প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখা' এবং রবীন্দ্রনাথের "অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা" শব্দ এবং অর্থ উভয়গত ভাবেই একই বস্তু বা একই ব্রহ্মজ্যোতির নির্দেশ করিয়া থাকে।

মহাভারতে মহর্ষি বশিষ্ঠের যে উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একস্থানে বলা হইয়াছে—"আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎ-সম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন॥"

বশিষ্ঠদেবের বর্ণিত আত্মদর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের কথিত দর্শন—এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

মহাভারত হইতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, ব্যাসদেব এবং বশিষ্ঠদেবের যে উপদেশ কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে একবাক্যে এই সত্যই কথিত হইয়াছে যে, এই দেহেই ব্রহ্মের জ্যোতিরূপটি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জ্যোতি বা বিধূম পাবক-শিখা আর রবীন্দ্রনাথের 'দীপ্তিময়ী শিখা' এক বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি ভূমাকে ধ্যানচোখে দেখিয়াছেন। তারপর তিনি বলিয়াছেন,—'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'-কে তিনি 'ইন্দ্রিয়ের পারে' দেখিয়াছেন এবং এই দুইটি দর্শনে ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—অনির্বাণ দীপ্ময়ীশিখাকে দেহমধ্যে তিনি দেখিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীতই এবং স্বতই বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রেও তিনি ব্রহ্ম-দর্শনের কথাই বলিয়াছেন। উপরন্তু, যোগাদিশাস্ত্র এবং মহাভারতের প্রমাণ হইতেও আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট এই "অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা" ব্রহ্মেরই প্রকাশিত জ্যোতিরূপ। কাজেই আমরা এখন ঘোষণা করিতে পারি—রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

এই সিদ্ধান্তের কোন সমর্থন উপনিষদে পাওয়া যায় কি না, ইহাই অতঃপর আমাদের দ্রষ্টব্য—

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্যোতিশব্দের বহুল প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'—জ্যোতির জ্যোতি এবং সে-জ্যোতি কদাচ ইন্দ্রিয়-গোচর বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, "হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—হৃদয়ের অভ্যন্তরের জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষ॥" বৃহদারণ্যক ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মের প্রকাশরূপ সম্বন্ধে অন্যত্র বলিয়াছেন, "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তম্—সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেন বিদ্যুতের ভাতি॥"

মুণ্ডক উপনিষদ ব্রহ্মকে বলেন, "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়োহি শুভ্রো—হৃদয়াকাশে শুদ্ধ জ্যোতির্ময়॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, "অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রবিতুল্য-রূপ॥"

ছান্দোগ্য উপনিষদ বিদেহমুক্ত পুরুষের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—ব্রহ্ম পরম জ্যোতি, জীব মুক্ত অবস্থায় তাঁহাতে মিলিত হয়॥"

সর্বশেষে কঠোপনিষদের একটি ব্রহ্ম-উপদেশ উদ্ধৃত হইতেছে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য—যিনি ত্রিকালের ঈশান (নিয়ন্তা), তিনিই নির্ধূমজ্যোতিসদৃশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষরূপে 'মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি'—শরীরের মধ্যে অবস্থিত॥"

যে কয়টি শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে উপনিষদের স্পষ্ট উপদেশ এই—ব্রহ্ম পরমজ্যোতি এবং সেই পরমজ্যোতি এই দেহমধ্যেই রহিয়াছে। হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'জ্যোতি' বলিতে উপনিষদ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটি রূপ দেখা যায়—চিৎ-রূপ এবং আনন্দ-রূপ। এই চিৎ-রূপই জ্যোতি। ভাষান্তরে চৈতন্যের পরিপূর্ণতা অথবা চৈতন্যের প্রকাশরূপই জ্যোতি। ব্রহ্ম রূপের অতীত, জ্যোতিই তাঁহার প্রকাশরূপ, ইহা গেল উপনিষদের প্রথম উপদেশ। দ্বিতীয় উপদেশ হইল—এই জ্যোতি দেহেই বিদ্যমান। আর তৃতীয় উপদেশ হইল,—এই জ্যোতিষাং জ্যোতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

স্বভাবতই এবং সঙ্গতভাবেই আমরা এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ দেহমধ্যে যে "অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা"-কে দেখিয়াছেন, তাহা এই

জ্যোতি ব্যতীত কি হইতে পারে? অর্থাৎ এই দীপ্তিময়ী শিখা উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি ভিন্ন অপর কিছু নহে। দেহের যবনিকা যদি কেহ প্রকৃতই ভেদ করিতে পারেন, তবে এই জ্যোতিই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে। কারণ, সকল দেহ বা অস্তিত্বের ভিত্তিতে আশ্রয়রূপে এই ব্রহ্মজ্যোতিই অবস্থিত, সেখানে আর কোন জ্যোতিরই অস্তিত্ব সম্ভব নহে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা'-ই যে ব্রহ্মজ্যোতি, ইহা প্রমাণের জন্য আর অধিক বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন করে না। এই 'দীপ্তিময়ী শিখাই' যে ব্রহ্ম, তাহার সন্দেহাতীত প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বিবরণেই রহিয়াছে। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেহের আবরণ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা'র সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

কোথায় কিম্বা কোন্ উপায়ে এই জ্যোতি দেখা যায়, তাহা যখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, তখন সত্যাসত্য বিচারে কোন অসুবিধা হইবারই কথা নহে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসরণ করিলে গন্তব্য ব্রহ্মে অথবা অন্যত্র গিয়া পরিসমাপ্ত হয়, এই অনুসন্ধানই অতঃপর কর্তব্য।

'দেহের যবনিকা' বলিতে রবীন্দ্রনাথ দেহকেই যবনিকা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ থাকিতে পারে না। দেহকে যবনিকা বলার তখনই একটা অর্থ হয়, যদি দেহ বস্তুত কোন কিছুকে আবৃত বা আচ্ছাদিত বা আড়াল করিয়া রাখিয়া থাকে। দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন, দেহ তাঁহাকেই আড়াল করিয়া রাখিতে পারে, কারণ দেহে দেহী ব্যতীত অপর দ্বিতীয় কিছু থাকিতে পারে না।

উপনিষদ বলেন, এই দেহে যিনি দেহী, তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। উপনিষদ আরও বলেন, দেহে থাকিয়াও দেহী স্বয়ং বিদেহী, দেহ তাঁহার 'পুর' বা 'কোষ'মাত্র। এই দেহপুরে যিনি দেহী, সেই আত্মাই দেহের যবনিকা সরাইলে উপনিষদের উপদিষ্ট 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতি', 'বিধূম পাবক', 'স্বয়ং জ্যোতি' ইত্যাদি রূপেই লক্ষিত হন। রবীন্দ্রনাথের 'অনির্বাণ দীপ্তিশিখা' তাঁহারই নামান্তরমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ দেহকে 'যবনিকা' অর্থাৎ আবরণ বলিয়াছেন এবং এই আবরণেই আত্মা বা ব্রহ্মজ্যোতি আবৃত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই দেহ সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ কি, তাহা একটু জানা দরকার।

উপনিষদে ব্রহ্মকে 'গুহাহিতং' বলিয়া বহুল উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই দেহে 'হৃদয়-গুহায়' ব্রহ্ম অবস্থিত, ইহাই উপনিষদের উপদেশ। যথা,—

'তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং (কঠ)—তিনি দুর্জ্ঞেয়, শরীরে অনুপ্রবিষ্ট, হৃদয়-গুহায় প্রতিষ্ঠিত।'

—"ব্রহ্ম পরামৃতম্ নিহিতং গুহায়াম (মুন্ডক)...এই পরম ও অমৃত ব্রহ্ম হৃদয়-গুহায় অবস্থিত।"

—"আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম (মুণ্ডক)—এই জগতে জীবগণের মধ্যে গুহাতে তিনি স্থিত।"

—"সর্বভূতগুহাশয় (শ্বেতাশ্বতর)—তিনি সর্বভূতের মধ্যে গুহাশায়ী।"

—"আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ (শ্বেত)—আত্মা প্রাণিবর্গের গুহায় স্থিত" ইত্যাদি ॥

উপনিষদের উদ্ধৃত উপদেশ হইতে এইটুকু জানা গেল যে, জীবদেহে একটি 'গুহা' আছে, যেখানে ব্রহ্ম নিহিত বা স্থিত আছেন। কোন্ স্থানকে গুহা বলা হইয়াছে, তাহার চাইতে কোন্ অর্থে উপনিষদ গুহা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই সমধিক দ্রষ্টব্য। আচার্য শঙ্কর বলেন যে, 'গুহা' শব্দটি আবরণার্থক 'গুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞাতাজ্ঞেয় পদার্থ-ত্রয় যেখানে এবং যাহা দ্বারা আবৃত তাহাই গুহা।

রবীন্দ্রনাথও দেহকে ব্রহ্মের যবনিকা বা আবরণরূপেই দেখিতে পাইয়াছেন, কাজেই এদিক দিয়াও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির পূর্ণ সমর্থনই উপনিষদে রহিয়াছে, দেখা গেল।

উপনিষদে তিনটি শরীরের উপদেশ রহিয়াছে, দেখা যাইবে। ঐতরেয় উপনিষদ বলেন,—"তস্য ত্রয় আবোসথাঃ এই দেহেই আত্মার তিনটি বাসস্থান ॥"

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি দেহই তাঁহার পূর্বোক্ত আবাসত্রয়। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদেও এই একই উপদেশ রহিয়াছে। এই তিনটি শরীরকে উপনিষদে তিনটি 'অবস্থা' বলিয়াও উপদেশ রহিয়াছে—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ বলেন,—সুষুপ্তির আবরণমুক্ত আত্মাই তুরীয় এবং ইহাই আত্মার ব্রহ্মরূপ। অর্থাৎ দেহের আবরণ অপসৃত হইলে এই আত্মাই লক্ষিত হন এবং এই আত্মাকেই উপনিষদ বলিয়াছেন—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥"

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটি শরীরের উল্লেখ উপনিষদ করিয়াছেন। স্থূল শরীরকেই 'ভোগায়তন' বলা হয়। স্থূলদেহ হইতে চেতনা প্রত্যাহৃত হইলে জীব সূক্ষ্মদেহে প্রবিষ্ট ও কেন্দ্রস্থ হয়, তখন তাহার স্বপ্ন-অবস্থা। এই সূক্ষ্ম শরীরকে (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ+মন ও বুদ্ধি) 'লিঙ্গশরীর' বলা হয়। সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

আর সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে যে শরীর অবস্থিত, তাহাকেই বলা হয় কারণ-শরীর। সূক্ষ্ম শরীর হইতেও চেতনা যখন অপহৃত বা প্রত্যাহৃত হয়, তখনই

জীবের সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তিস্থানের আত্মাকেই মান্ডুক্য উপনিষদ বলিয়াছেন—"প্রাজ্ঞ" এবং ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, "সম্প্রসাদ"।

এই সুষুপ্তির আবরণ বা কারণ-শরীরমুক্ত অবস্থাই আত্মার ব্রহ্মরূপ। আর এই সুষুপ্তিকেই অথবা কারণ-শরীরকেই উপনিষদে বলা হইয়াছে—অবিদ্যা, মায়া, তমসা ইত্যাদি। এই কারণ-শরীর বা সুষুপ্তির তমসা ভেদ করিয়াই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি॥"

আর রবীন্দ্রনাথও তেমনি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের এই আবরণ ভেদ করিয়া বলিয়াছেন—"দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥" এই জ্যোতি-শিখাই তুরীয় আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

স্থূলদেহ হইতে সজ্ঞানে সূক্ষ্মদেহে আসিয়া অবস্থান কবার নামই ধ্যান, ইহা হইল দেহের প্রথম আবরণ ভেদ বা অপসারণ, অথবা দেহের প্রথম যবনিকা উন্মোচন, বা উত্তোলন।

তারপর সেই সূক্ষ্ম শরীর হইতে সজ্ঞানে চেতনাকে কারণ-শরীরে প্রত্যাহার বা নেওয়া। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে সজ্ঞানে অবস্থিতির নামই সমাধি। ইহা হইল দেহের দ্বিতীয় আবরণ ভেদ করিয়া তৃতীয় শরীরে প্রবেশ ও অবস্থান।

তৎপর সজ্ঞানে চেতনাকে কারণ-শরীর বা সুষুপ্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত করিতে পারিলেই ব্রহ্মচৈতন্যে বা জ্যোতিতে জীবের প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই হইল তৃতীয় এবং শেষ শরীর ভেদ বা উন্মোচন।

এই তৃতীয় শরীর পার না হইলে 'অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা' কদাচ দৃষ্টি-গোচর হয় না। বৈদিক ঋষির প্রসিদ্ধ প্রার্থনামন্ত্রে ইহাকেই বলা হইয়াছে—তমসা হইতে জ্যোতিতে গমন এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তরণ।

"দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ও উপলব্ধির আড়ালে কি সাধনা ও শক্তি নিহিত আছে, ইহা হইতেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার রবীন্দ্রনাথকে কবিতায় একখানি চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথও কবিতায় সে-পত্রের উত্তর দেন। দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কবি-ঋষি, অর্থাৎ দ্রষ্টা সে-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। সে-উত্তরে আপন উপলব্ধির কথাই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রখানি উদ্ধৃত করিবার অবকাশ নাই, পত্রখানি পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, তাহা ব্রহ্মোপলব্ধির রসে বা আনন্দে আদ্যন্ত ওতপ্রোত।

পত্রের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

চিরপ্রশ্নের বেদী সম্মুখে
চিরনির্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর।

অনন্ত জিজ্ঞাসা আর অনন্ত মৌন চির-মুখোমুখী দাঁড়াইয়া—এই দর্শন কোন্ দৃষ্টিতে বা কাহার দৃষ্টিতে সম্ভব? এখানে একাধারে ঋষির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা দুইয়েরই সাক্ষাৎ আমরা পাইয়া থাকি।

ইহার পরেই তাঁহার পত্রে রবীন্দ্রনাথ খবর জানাইয়াছেন—

চকিত আলোকে কখনও সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা ॥

'সুন্দর' বলিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহাকেই বুঝাইয়াছেন, উপনিষদ যাঁহাকে বলিয়াছেন—'আনন্দ' এবং 'রসো বৈ সঃ'; কারণ ইহার পূর্বে 'পরম' এবং পরে 'অমৃত' এই শব্দ দুইটির প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন।

'চকিত আলোকে সহসা' সুন্দরের দেখা দেওয়া এবং 'তবুও ধরা না দেওয়া' —উপনিষদে এই উপলব্ধির পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। ব্রহ্মকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই ধরা যায় না, এ-আলোচনা একাধিকবার করা হইয়াছে। 'চকিত আলোকে কখনও সহসা' দেখা দেওয়ার সামান্য একটু সমর্থন উপনিষদ হইতে উদ্ধার করা যাইতেছে।

কেনোপনিষদে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"যদেতৎ বিদ্যুতোবাদ্যুতদ আ ন্যমীমিষদ্ আ—সেই ব্রহ্ম বিষয়ে এই উপদেশ, এই যে বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হইল, ইহারই সদৃশ। আর এই যে চক্ষুর নিমেষ হইল, ইহারই সদৃশ॥"

ক্ষণিকের বিদ্যুৎপ্রকাশ যেমন যুগপৎ বিশ্বব্যাপী হয়, ব্রহ্মজ্যোতিও তেমনি ক্ষণিক বিদ্যুতালোকের ন্যায় অনন্তকে চিরন্তনকে শাশ্বতকে একটি মুহূর্তের মধ্যেই উদ্ঘাটিত করে। তাই রবীন্দ্রনাথও দেখিতে পাইয়াছেন—চকিত আলোকে কখনও সহসা দেখা দেয় সুন্দর।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেরও ঠিক এইরূপ একটি উক্তি পূর্বেই অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তম্—সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেমন বিদ্যুতের ক্ষণিক ভাতি॥—রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বিবরণে এই উপদেশেরই প্রতিধ্বনি বা প্রতিরূপ পাওয়া যায়।

ইহার পরে তাঁহার পত্রে কোনরূপ গোপন না করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলিয়া ফেলিয়াছেন—

> দেখেছি দেখেছি এই কথা বলিবারে
> সুর বেধে যায় কথা না যোগায় মুখে,
> ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
> পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে॥

এই ঘোষণার অর্থ এত স্পষ্ট যে, কোনরূপ ব্যাখ্যারই প্রয়োজন করে না। যাহা চোখে দেখা যায়, তাহা দেখিয়া কেহ 'দেখেছি দেখেছি' বলিয়া এমন বিস্ময় এবং আনন্দ কদাচ প্রকাশ করিতে পারে না। আর, 'সেকথা বলিবারে সুর বেধে যায় কথা না যোগায় মুখে'—এমন অবস্থাও নিশ্চয় হয় না।

যাঁহাকে চোখে দেখা যায় না, তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, তাই রবীন্দ্রনাথের এত বিস্ময় এত আনন্দ। তাঁহাকেই তিনি পত্রের পরবর্তী ছত্রে বলিয়াছেন 'পরশাতীত'—তিনি শুধু স্পর্শেরই অতীত নহেন, তিনি চক্ষুরাদি

অপর ইন্দ্রিয়েরও অতীত। তাই তো রবীন্দ্রনাথের এমন বিস্মিত এবং আনন্দিত ঘোষণা—"ধন্য যে আমি, একথা জানাই কারে!"

"পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে"—রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে 'পরশাতীত' বলিতে ব্রহ্মকে এবং 'হরষ' শব্দে ব্রহ্মের 'আনন্দ'-কেই বুঝানো হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে দেবর্ষি নারদের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে, দেবর্ষি নারদের উক্তিটি এই—"সুখই এই শরীরে দৃশ্যমান ভগবানের রূপ॥"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'দেখেছি দেখেছি' ; আর দেবর্ষি নারদ বলেন যে, ভগবান যদি দৃশ্যমান হন-ই, তবে সুখ রূপটি লইয়াই তিনি শরীরের মধ্যে দেখা দেন। তাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে দেখা যায় যে, যাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাকে 'হর্ষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, 'সুখই এই শরীরে দৃশ্যমান ভগবানের রূপ ;" আর রবীন্দ্রনাথ সেই সুখস্থানটি আরও বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে॥" অর্থাৎ, হৃদয়েই তিনি সেই 'পরশাতীতের' আনন্দ-রূপটি দেখিতে পাইয়াছেন।

বুকই পরশাতীতের হর্ষস্থান, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির কোন সমর্থন উপনিষদে আছে কি ?

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপদেশে পাওয়া যায়, "স বা এষ আত্মা হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়মিতি। তস্মাৎ হৃদয়ম্"—সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত এইরূপ। 'হৃদি অয়ম,' তাই হৃদয়কে হৃদয় বলা হয়॥"

ছান্দোগ্য ও অপরাপর উপনিষদে এই হৃদয়কেই 'হৃদয়পুন্ডরীক' হৃদয়পদ্ম বলা হইয়াছে। হৃদয় বলিতে বক্ষকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বুকে কে আছেন? উত্তরে উপনিষদ বলেন, "হৃদ্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ং"—হৃদয় আকাশই সেই কোশ, যাহা আনন্দের পরম আলয়॥"

এখানে বুককেই পরম আনন্দের আলয় বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে'—এই সত্যেরই উপলব্ধি। সর্বোপনিষদেই হৃদয় আকাশের উল্লেখ আছে এবং কোন কোন উপনিষদে এই আকাশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অপর একটি উপলব্ধিতে উপনিষদের এই তত্ত্বটি উপনিষদ অপেক্ষাও মনোরম ও হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যাইবে—

এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে॥

আলোচ্য পত্রে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, জীবনে দুঃখ পাইয়াছেন, দৈন্যও ঘিরিয়াছে, মানুষের কুশ্রীতা কদর্যতাও বহু দেখিয়াছেন, সবই সত্য। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও বড় বা পরম সত্য এই—

তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্তশিবের বাণী॥

উপনিষদ ব্রহ্মকে বলিয়াছেন—'শান্তং শিবং', আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই বলিয়াছেন 'চিরদিবসের শান্ত শিব' এবং তাঁহারই যে মৌন-বাণী সৃষ্টির যাবতীয় কোলাহলের আড়ালে 'অনাহত' ধ্বনিত হইতেছে, সেই বাণীই তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, এই কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত পত্রখানিতে জানাইয়াছেন। এই 'অনাহত নাদ' পৃথিবীর এই আকাশে শোনা যায় না, সে-নাদধ্বনি যে আকাশে শোনা যায় তাহারই নাম আকাশ-ব্রহ্ম।

পত্রটির আলোচনা পত্রের শেষ কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াই শেষ করা যাইতেছে। শেষ কয়টি কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলব্ধির চরম কথাটিই জানাইয়াছেন. পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, বিশ্লেষণের দরকার হইবে না। কথা কয়টি এই—

জীবনের যাহা জেনেছি অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে॥

এখন অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মোপলব্ধিরই ঘোষণা—

একদা পথ চলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পান যে, মৃত পশুর একটি কঙ্কাল পথের একপাশে পড়িয়া আছে;—পশুর এই অস্থিরাশি যেন কালের

নীরস অট্টহাসি, এ যেন মরণের অংগুলি নির্দেশ। দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে হইল, এই নির্দেশ যেন ইংগিতে এই কথাই কহিতে চাহে—"একদা পশুর যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্তঃ ভেদ নাই লেশ।" এই অকথিত উক্তির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন—

আমি বলিলাম—

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ॥

'রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান' বলিতে রবীন্দ্রনাথ রূপের আড়ালে যিনি অরূপ তাঁহাকেই বুঝাইয়াছেন এবং তিনিই উপনিষদের ব্রহ্ম। উপনিষদ জগতের যাবতীয় রূপকে বলিয়াছেন "অরূপের রূপ"—যাঁহার রূপ নাই, তাঁহারই রূপ এই সমস্ত। অর্থাৎ, জগতের এই বহু রূপ সেই অরূপীরই বহুরূপী প্রকাশমাত্র।

উপনিষদ বলেন, 'অশব্দমস্পর্শমরূমব্যয়ম। তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ"—ব্রহ্ম শব্দহীন রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, অক্ষরবস্তু॥ ব্রহ্মকে রূপহীন ইত্যাদি বলিয়াই উপনিষদ সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন—

একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥

—যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, তিনিই নিগূঢ় প্রয়োজনে বিবিধ শক্তিযোগে নানা বিভাব ধারণ করেন॥

এই কারণেই রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান, অর্থাৎ রূপের মাধ্যমেই অরূপকে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। অরূপকে পাওয়াই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি তথা ব্রহ্মদর্শন।

"দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান"—এ-কথার অর্থ কি? ইহা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি সকল দর্শন শাস্ত্রেই জগৎকে 'দুঃখ' বলা হইয়াছে। এমন যে গীতা, তিনিও জগতকে 'দুঃখের আলয়'

বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এক বেদান্ত দর্শন ব্যতীত সকল দর্শনেই জগৎকে দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

একমাত্র বেদান্ত-দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রই জগতকে বলিয়াছেন—ব্রহ্মেরলীলা। লীলা বলিতে দুঃখ বুঝায় না, বুঝায় ব্রহ্মের আনন্দলীলা। উপনিষদ স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন—এই জগৎ ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। কিন্তু জগতের দুঃখ-রূপটিই প্রকাশিত এবং তাহাই আমাদের দৃষ্টিতে ও জীবনে নিত্য প্রমাণিত হইয়া থাকে। জগতের যদি কোন আনন্দ-রূপ থাকিয়াও থাকে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে গুপ্ত বা অ-দৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ জগতের দুঃখ-রূপটিকে একান্ত অস্বীকার করেন নাই, সেই রূপটিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর সেই দুঃখের আড়ালে আনন্দকেও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—"দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।" কেবল ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতেই জগতের এই আনন্দ-স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-দৃষ্টিপ্রাপ্ত বা ব্রহ্মদর্শন-প্রাপ্ত পুরুষ।

"অনন্ত মৌনের বাণী," এবং "শূন্যময় অন্ধকারে জ্যোতির পথ"—উভয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে পাই 'অনাহত নাদ'-কে অর্থাৎ শব্দব্রহ্মকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা পাই 'জ্যোতির্ব্রহ্মকে।' এই উভয় আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি না করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে যে, এই উপলব্ধিতেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে ব্রহ্মদর্শনের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন রবীন্দ্রনাথের একই সময়ের গুটি তিনেক উপলব্ধির উল্লেখ করা যাইতেছে। উপলব্ধি কয়টির একই পটভূমিকা—১৯৩৭ সালে তিনি যখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়কার কয়েকটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিবরণ কবিতায় তিনি ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অভিজ্ঞতা কয়টির পটভূমিকা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এইভাবে চিত্রিত হইতে পারে—

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে॥

অর্থাৎ মৃত্যুর একখানি কালো পর্দা পিছনে রাখিয়া এই অভিজ্ঞতা কয়টিকে দেখিতে হইবে। উপলব্ধি কয়টির বিশেষ কোন ব্যাখ্যা করা হইবে না, কারণ পূর্ববর্তী উপলব্ধিসমূহের ব্যাখ্যাই এক্ষেত্রেও সমান প্রয়োজ্য। কাজেই তাহার অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি হইতে বিরত থাকিলে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যা পার্শ্বে যাঁহারা উপস্থিত তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। আসলে কবির চেতনা রোগের অন্তরালে এক গভীরে বা ঊর্ধ্বে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই বাহির হইতে তাঁহাকে চেতনাশূন্য সংজ্ঞাহারা মনে হইয়াছে। সেদিন নিজের যে উপলব্ধি বা অবস্থা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেই তিনি প্রথমে এইকথা বলিয়াছিলেন—

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে॥

ইহার পরে তিনি দেখিতে পান—

শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে।

'জ্যোতির তর্জনীর' স্পর্শ ; ইহার ফলে বা পরে—

পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীর বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা॥

অবস্থাটা আরও পরিষ্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন—

অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরি ব্যবধান সম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্ত বিচ্যুত॥

এই অবস্থায় থাকিয়াই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন -

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে॥

অহং-এর পরিপূর্ণ বিলয়ের পরেই দেখা দেয় আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাহাই 'বন্ধমুক্ত আপনারে' লাভ করা। আপনার পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপেই তিনি সেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণার নির্গলিতার্থ।

আর একদিনের এমনই এক অবস্থা বা উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন যে, জীবন বা জগতের সঙ্গে তাঁহার বন্ধন-সূত্রটি আসলে একটি স্বপ্ন-সূত্রমাত্র। অকস্মাৎ 'জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের' সেই সূত্রটি 'অদৃশ্যঘাতে' ছিঁড়িয়া গেল, ইহা তিনি দেখিতে পান। তারপর তিনি জানাইয়াছেন,

সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘপথ অতিদূর নিঃশব্দের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে॥

'দূর নিঃসঙ্গ নিরাসক্ত নির্মম' ইত্যাদি উক্তিতে কাঁহাকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, খুলিয়া বলার দরকার করে না। ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন,

অকস্মাৎ মহা একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন॥

'মহা একাকী' বলিতে ব্রহ্মকেই তিনি বুঝাইয়াছেন, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। আর, 'অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্ক' অন্য কিছু নহে, বিদেহমুক্ত জ্যোতির্ময় পুরুষদেরই জ্যোতিষ্করূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন বা বর্ণনা করিয়াছেন, শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ করিয়া রাখা গেল।

সেই সময়কার সর্বশেষ উপলব্ধির উল্লেখ এখন করা যাইতেছে। এই বিষয়ে পূর্বে অন্যত্র যাহা লিখিয়াছিলাম, সেইটুকুই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জীবনের শেষ দিনে ঋষি-কবি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই সময়ে এক-দিন তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বহুক্ষণ ছিলেন, শয্যার পার্শ্বে পরিচর্যারত সেবক এবং ভক্তগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে, সংজ্ঞা আবার ফিরিয়া আসিবে, না ইহাই মৃত্যুর প্রথম স্পর্শ! সংজ্ঞা তাঁহার সেবার ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং একটু সুস্থ হইয়া তাঁহার এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার যে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি ঋষি কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ কারণেই একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেদিনের সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালোকালিন্দীর স্রোত বাহি,
.........ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশে করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক॥

এ কাহার চিত্র? একী মৃত্যু-পীড়িত হৃতচৈতন্য সংজ্ঞাহীন পুরুষ বা প্রাণীর চিত্র? না তাহা নহে। ইহা দেহাতীত পরম চৈতন্য সত্তায় অবস্থিতিরই এক অমর অভিজ্ঞতা, ইহা মহাযোগীর মহাযোগ-নিমগ্ন মূর্তি, ইহা সমাধির শিখর চূড়ায়

শিবজ্যোতি ও জীবজ্যোতির পূর্ণ মিলন চিত্র, ইহাই ব্রহ্মচৈতন্যে আত্মচৈতন্যের পরিপূর্ণ আত্মাহুতি বা অদ্বৈতসিদ্ধি। সোঽহং, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি এবং তত্ত্বমসি—চতুর্বেদের চারটি মহাবাণীর ইহাই তো পূর্ণতম উপলব্ধি।"

তাঁহার সেই দিনকার এই সমস্ত অবস্থা বা অভিজ্ঞতার উপসংহার রবীন্দ্র-নাথ যেভাবে করিয়াছেন, অতীতে কোন ঋষির কণ্ঠে তাহা উচ্চারিত হইয়াছে কিনা জানি না। হইয়া থাকিলেও এমনভাবে এমন ভাষায় সে কথা নিশ্চয় কেহ জানাইতে পারেন নাই, যেভাবে এ যুগের ঋষি কবি জানাইয়াছেন—

এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে ॥

(১৫)

রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদৃচ্ছক্রমে কিছু উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। আমাদের যে মূল প্রশ্ন 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কি না', এই উদ্ধৃত উক্তিসমূহে সে জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো সর্বত্র নাও পাওয়া যাইতে পারে ; তথাপি এই উদ্ধৃতিসমূহে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চরিত্রের উপর যে আলোকপাত করিবে, আমাদের বিচার্য বিষয়ের দিক দিয়া তাহা উপেক্ষণীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের ঋষি-চরিত্রেরই বিভিন্ন চিত্র বা দিক এই উক্তিসমূহে আমরা স্বয়ং কবি কর্তৃকই অঙ্কিত বা উদ্ঘাটিত দেখিতে পাইব।

বছর পঞ্চাশেক বয়স হইবে, সেই সময়ে নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোম-হুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে॥"

বলা বাহুল্য, অসৎ হইতে সতে, তমসা হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে 'মহানিষ্ক্রমণের দ্বার'টিই ঋষির অন্তরের এই তপস্বিনী খুঁজিয়াছে। দ্বার কি খোলা পাইয়াছে এই তপস্বিনী? পরবর্তী উদ্ধৃতিতে উত্তর হয়তো পাওয়া যাইতে পারে—

"বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন, সেখানে তাঁর চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করিনি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি, 'হে

রাজন, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি তো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্তকালের সম্বন্ধ॥"

'মহানিষ্ক্রমণের দ্বার' খুঁজিয়া না পাইলে 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরের' 'চরণে গিয়া উপবেশন' করা কখনো সম্ভবপর হয় কি? উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মকে পিতা, সখা বলিয়া জানিয়াছেন এবং সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, আর এ-যুগের ঋষি তাঁহাকে 'পরম প্রিয়' বলিয়াই জানিয়াছেন, এখানে দেখা যায়। আর দেখা যায় যে, সেই 'পরম প্রিয়ের' পাশে প্রেমের স্বাধিকারেই আপন আসন দাবী করিয়াছেন।

১৩১১ সালে নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ-লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা॥"

'কেবল অনুভবের দিক দিয়া' এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আসলে তাঁহাকেই অনুভব—যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

পূর্বোক্ত উক্তিটির বহু পূর্বে লিখিত একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে এই কয়টি কথা এক আত্মীয়াকে জানাইয়াছিলেন—

"ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারিনে। কিন্তু মনে ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময়ে অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোন একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব॥"

'একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়', বলিতে কি বুঝায়, সে-

ব্যাখ্যা হইতে আমরা বিরত থাকিতে পারি। এ-পত্র লেখার কয়েক বৎসর পরে শান্তি-নিকেতনের এক উপাসনা-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই 'অন্তরিন্দ্রিয়ের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। সেইটুকু উদ্ধৃত করিলেই আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। সে উপাসনা-ভাষণে তিনি বলিয়াছেন—

"উপনিষৎ তাঁকে বলেছেনঃ গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং। অর্থাৎ, তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না—তিনি লুকানো আছেন ; বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে॥"

তাঁহার চিঠিতে যে 'নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়'-এর কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং' যে-ব্রহ্ম, তাঁহাকেই দর্শনই ইহার কাজ। রবীন্দ্রনাথের 'অন্তরিন্দ্রিয়' তাঁহার দর্শন পাইয়াছে কিনা, চিঠিতেই সে প্রশ্নের জবাব আছে যেখানে তিনি বলিয়াছেন—'বেশ বুঝতে পারছি, আমি আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।'

পূর্ণকে দেখিলেই তবে 'জীবনের সমগ্রতা' বা পূর্ণতা দান সম্ভবপর হয়। তাহার পূর্বে সমগ্রতা বা পূর্ণতার কোন আভাস মাত্রও জীবনে কাহারও আসে না, পূর্ণতা বা সমগ্রতা দানের আশা জীবনে দেখা দেওয়ার কথা তো উঠেই না।

৬৫ বৎসরে পদার্পণ করিয়া একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আজ বাইরে বসে খেলার চেয়ে খেলনার সাথীকেই বেশী দেখতে পাচ্ছি।... যাকে প্রবীণেরা মায়া বলে বর্ণনা করে সেই অনিত্যের খেলাঘরে সে কোন্ আশ্চর্যকে দেখতে পেল? যাঁকে দেখেছিল পূর্বদিগন্তে উষার প্রদোষ আলোয়, তাঁকেই দেখল পশ্চিম সিংহদ্বারে তারার প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। যেতে যেতে বলতে পারব, দেখেছি॥"

'অনিত্যের খেলাঘরে' কে সে আশ্চর্য, যাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন? উপনিষদ যাঁহাকে বলিয়াছেন 'নিত্যঃনিত্যানাং' এই সমস্ত অনিত্যের যিনি নিত্য আশ্রয় বা এই সমস্ত অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, তাঁহাকেই 'আশ্চর্য' বলিয়া উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন, এই কথাই তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন।

এই চিঠিখানির আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছু করিনে কেবল সামনে চেয়ে বসে আছি—দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে॥"

শূন্যকে আমরা শূন্যই দেখি। কিন্তু এ কোন 'পূর্ণতা', যাহা শূন্যকেই পূর্ণ করিয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে?

তপোবনের ঋষির একটি প্রার্থনা-মন্ত্রে আছে "তোমার এই শূন্যতাকে পূর্ণ করিব নিজে শূন্য হইয়া।" অহং-এর নিঃশেষে বিলোপই 'নিজে শূন্য হওয়া' এবং অহং সরিয়া গেলে শূন্যকে যিনি পূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হন, তিনিই আত্মা। এঁরই এক নাম পূর্ণ এবং তাঁহাকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিয়াছেন—"দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে।"

নিজের 'জীবনবৃত্তান্ত' লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে এই কয়টি কথা আছে।

"কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি, তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে; তখনি একথা বলিতে পারিয়াছি: যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা॥"

ভাষ্য বা ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এই 'জীবন বৃত্তান্তের'-ই অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, অসীম নাম দিয়া কোনো জিনিষকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ॥"

'অনন্তের প্রকাশকেই' বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন 'দেবস্যকাব্যং', আর উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন 'আনন্দলীলা' এবং এই দুইয়েরই ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে।

সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্র জয়ন্তী (১১ই পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রতিভাষণে' নিজের সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ এই কয়টি কথা জানাইয়াছিলেন—

"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম

চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হলনা, বিস্ময়ের আর অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম ॥"

'অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত', সেই বাণীরই উপনিষদ নাম দিয়াছেন—শব্দ-ব্রহ্ম।

ইহার পরে এই 'প্রতিভাষণে' রবীন্দ্রনাথ খুলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

"প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে, যত্তেরূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠেছে কোহ্যেবানাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ ॥"

তপোবনের ঋষিকেই কি এখানে নূতন মূর্তিতে দেখা যাইতেছে না? ঋষির ব্রহ্ম ঘোষণাই কি তিনি অসংখ্য জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এখানে করিয়া যান নাই যে, তিনি তাঁহারই কল্যাণতম রূপকে দেখিয়াছেন, যিনি আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দ?

সত্তর বৎসরের এই 'প্রতিভাষণের' উপসংহারে আসিয়া নিজের সমগ্র জীবন, কর্ম্ম ও কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রায় দিয়াছেন দেখা যায়—

"সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি এবং সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালণ করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি ॥"

যে কথা একান্ত গূঢ় ও গোপন, জনসভায় দাঁড়াইয়া আপনার সেই পরিচয়ই ঋষি কবি এখানে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। দেশবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আড়ালে দেশবাসীর জিজ্ঞাসিত একটি অনুচ্চারিত প্রশ্নই হয়তো তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন

—কে তুমি? কি তোমার সত্য পরিচয়? তাই নিজেকে কিছুটা অনাবৃত করিয়া নিজের সত্য রূপটির কিছু আভাস তিনি দেখাইয়াছিলেন। সে রূপ সত্যদ্রষ্টা ঋষির রূপ, সে রূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরই রূপ।

আশি বৎসরে আয়ুর শেষ সীমায় আসিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয়টুকু লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে মাত্র দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাইতেছে।

প্রথম উক্তিটি এই—"সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন॥"

উপনিষদ বলিয়াছেন, পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদাস্যামৃতং দিবি—সৃষ্টি তাঁহার একপাদ আর ত্রিপাদ তাঁহার অমৃতলোকে। 'সৃষ্টির অতীত' বলিতে এই 'অমৃতংদিবি' অমৃত-স্বরূপ জ্যোতির্লোককেই বুঝানো হইয়াছে। সেখানে যাঁহার মন গিয়াছে, সেই ঋষিই কেবল বলিতে পারেন—'সার্থক হয়েছে আমার জীবন।'

এখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উক্তিটি উদ্ধৃত হইতেছে, যাহা আশি বছরে আয়ুর প্রান্তে আসিয়া তিনি আত্মপরিচয়ে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। উক্তিটি এই—

"নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যকে, তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে, সেই নিগূঢ়কে কী নাম দেব জানিনে।...কিন্তু আমি তাঁকে বারবার অনুভব করেছি। বিশেষভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছি তখন তাঁর উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে॥"

কার উপলব্ধি 'আরো স্পষ্ট' হইয়া উঠিয়াছে? উপনিষদের ভাষা আক্ষরিক গ্রহণ করিয়া তাঁহারই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—'দুর্দর্শম্ গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।' ইনিই ব্রহ্ম।

দেখা যাইতেছে যে, আশি বছরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন—'তাঁর (ব্রহ্মের) উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ কি না, এই প্রশ্নটি আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য, প্রশ্নটির বিচারের জন্য ইহারই শুধু আশ্রয় আমরা এতাবৎ একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে কিছুমাত্র গ্রহণ করি নাই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে আলোচ্যক্ষেত্রে কখনও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ কি ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ—এই প্রশ্নের বিচারে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা চলে কি না, ইহাই এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমরা মনে করি যে, আলোচ্য বিষয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা মোটেই অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে।

রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় ঋষিকবি, যেমন অতীতে জনককে বলা হইত রাজর্ষি। রাজকুলে যিনি ঋষি, তিনিই রাজর্ষি। তেমনি কবিকুলে যিনি ঋষি কিম্বা ঋষিকুলে যিনি কবি, তিনিই ঋষিকবি। যে কবি ঋষি হইয়াছেন, কিম্বা যে ঋষি কবি হইয়াছেন, ইহার যে কোন একটি অর্থই রবীন্দ্রনাথের 'ঋষিকবি' সংজ্ঞা সম্পর্কে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঋষি এবং কবি একই অর্থবাচক। উপনিষদেও ঋষি অর্থে কবি শব্দের বহু প্রয়োগ রহিয়াছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় তাঁহার ঋষিপরিচয়েরই একটা দিক বা প্রকাশ বলিয়াই আমরা মনে করি। ঋষি বলিতে রবীন্দ্রনাথকে পাই—দ্রষ্টারূপে এবং কবি বলিতে সেই দ্রষ্টাকেই পাই—স্রষ্টারূপে। আর দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা যে একেরই দুই রূপ, ইহা উপনিষদে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং কাব্য দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহারা সেখানে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন দেখা যায়। রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি বা কাব্য-সৃষ্টি ছাড়া নিশ্চয় এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা দার্শনিকদেরও উপজীব্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ 'রবীন্দ্রদর্শন' সম্বন্ধেই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মনীষী দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও রবীন্দ্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং আরও অনেকেই করিয়াছেন। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'কবি' বলিয়া তাঁহারা কেহই গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে দার্শনিক বলিয়াও গ্রহণে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন।

কেহ তাঁহার গবেষণায় দেখাইয়াছেন যে, উপনিষদ এবং বেদান্তই রবীন্দ্রদর্শনের উৎস।

কেহ বা বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রদর্শনে বৈষ্ণবধর্মেরই প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রদর্শনে বা রচনায় খৃষ্টধর্মের প্রভাব রহিয়াছে।

বৌদ্ধদর্শন বা কাহিনীর প্রভাবও কেহ কেহ রবীন্দ্র রচনা তথা দর্শনে দেখিয়াছেন।

সহজিয়া এবং বাউল সম্প্রদায়ের প্রভাব রবীন্দ্রদর্শনে অত্যন্ত স্পষ্ট, ইহাও অনেকে বলিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউলদের গান সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ এবং আকর্ষণের কথা বলিয়াছেন।

কবীর, দাদু প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রভাবও রবীন্দ্রদর্শনে অনেকে আবিষ্কার করিয়াছেন।

কেহ রবীন্দ্রনাথকে অদ্বৈতবাদী শংকরপন্থী বলিয়াছেন, আবার অপরে তাঁহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভিত্তিতেই রবীন্দ্রদর্শন এবং পূর্বোক্ত বিভিন্ন অভিমত সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু কবিতা নয়, তাহার চাইতেও একটু বেশী, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'কবি পরিচয়' একান্তভাবে কবিতেই সীমাবদ্ধ নহে, অন্তত এই কবি যে একজন 'দার্শনিক'—ইহাই মনীষিগণের পূর্বোক্ত রচনা ও অভিমতসমূহ হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

এখানে দেখা গেল যে, কবির কাব্যকে দর্শনেরই বিচার্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা

হইয়াছে। কবির মধ্যে অর্থাৎ কবির রচনায় একজন দার্শনিকই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর এখানেই আমাদের বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ 'দার্শনিক' নহেন, তিনি হইলেন—'দ্রষ্টা'।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যদি তাঁহার রচনাবলীকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি, এই কথা প্রমাণের জন্য তাঁহার রচনাবলীর সাহায্য কেন লওয়া যাইবে না? আমাদের বিচার্য বিষয়ে আমরা যদি রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে সাক্ষ্য, প্রমাণ ইত্যাদি উদ্ধৃত করি, তাহা আদৌ অযৌক্তিক বা অসংগত বলিয়া কদাচ বিবেচিত হইতে পারে কি?

রবীন্দ্রনাথের প্রথম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিটির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, উক্ত উপলব্ধিটি তাঁহার কবি-জীবনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সাধনা ও সৃষ্টিরই মূলে থাকিয়া এই প্রভাবটি সক্রিয় রহিয়াছে, ইহাই সেখানে দেখানো হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিতে 'জীবনদেবতা'র উল্লেখ করিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা রবীন্দ্র-রচনাবলীর আদৌ কোন সাহায্য গ্রহণ করিব কি না, ইহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমাদের জিজ্ঞাস্য শুধু এই—বিচার্য বিষয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলীকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে কি না? আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই অভিমতই অভিব্যক্ত হইয়াছে, হাঁ, এই বিষয়ে তাঁহার রচনাবলী প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা চলে এবং উচিতও।

নিজের সাহিত্য-সাধনা এবং সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আসিয়া পড়িবে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমতেরই গুরুত্ব সর্বাধিক। কাজেই, তাঁহার ঋষি চরিত্রের উপর তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কতটা আলোকপাত করে জানিতে হইলে নিজের সৃষ্টিকে ঋষিকবি কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সে আলোচনা অপরিহার্য।

অতঃপর সংক্ষেপে সে আলোচনাই করা যাইতেছে। ইহার পরে 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ'—ইহা প্রমাণের জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে কি না, সে সম্বন্ধে মনঃস্থির করার সুযোগ আমরা যথাসময়ে পাইব।

রবীন্দ্রনাথের 'আমার ধর্ম' নামক একটি প্রবন্ধ 'সবুজপত্র' নামক মাসিক পত্রে

প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শান্তিনিকেতন' (দুই খন্ড) নামক গ্রন্থকে বলা হয় উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাষ্য এবং বিশেষভাবে এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় এ যুগে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার। কিন্তু নিজের 'ধর্ম' ব্যাখ্যায় বা পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ এই 'শান্তিনিকেতন'-কেও বাতিল করিয়া এই কয়টি কথা বলিয়াছেন—

"কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"

সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে প্রকাশিত হয়, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সুনিশ্চিত অভিমত। অন্তত তাঁহার নিজের রচনায় তাঁহার আপন প্রকৃতিই অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন।

তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহার 'অন্তরতম' কথা বা চরিত্রটি ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কাজেই, নিজের সাহিত্যকেই তিনি নিজের 'ধর্ম' সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সাক্ষ্য বলিয়া 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।

সত্তর বৎসর বয়স পূর্তিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে তাঁহার 'প্রতিভাষণে' তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে পূর্বে কিছুটা উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও সেই উদ্ধৃতিটুকুর পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন মনে হইতেছে। তিনি সেখানে নিজের রচনা সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ বা এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন—

"অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেচি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম-পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট॥"

রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্য-সৃষ্টিকে স্বয়ং কি মনে করেন, সে প্রশ্নের উত্তর উদ্ধৃতিটুকুতে অতি স্পষ্ট। তিনি জগৎকে ভালোবাসেন, তিনি মুক্তিকামী যে-মুক্তি পরমপুরুষের মধ্যে আত্মনিবেদনে, যিনি সদা 'জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' তিনি তাঁহারও হৃদয়ে স্থিত ইত্যাদি ঘোষণাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ও সৃষ্টিতে তিনি করিতে

চাহিয়াছেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অভিমতে তাঁহার সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা এক মুক্তিকামী পুরুষের ব্রহ্মসাধনারই পরিচয় মাত্র।

এই জন্যই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সংগে সংগেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে॥"

কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন দুটি স্বতন্ত্র ধারা হইলেও তাহা অবিচ্ছিন্ন এবং যুক্তভাবেই প্রবাহিত, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন। ইহার অর্থ, তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিকেই তিনি, আপনার সত্যিকার জীবনচরিত্র বলিয়া মনে করেন। সোজা ভাষায়—রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চরিত্রেরই ফটো।

নিশ্চয় একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, কবি বা লেখকের রচনাকে তাঁহাদের আত্মজীবনী বলিয়া কখনো গ্রহণ করা চলে না, যেমন ডাক্তারের চিকিৎসা ব্যবসা তাহার ব্যক্তিগত জীবন চরিত্র নহে। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কবি-প্রতিভা এবং সৃজন-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি সেই শক্তিরই দান বা প্রকাশ, ইহার সংগে তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা বা সিদ্ধির কোন যোগ থাকিতে পারে না। কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ শিক্ষক, কেহ ব্যবসায়ী, তেমনি রবীন্দ্রনাথও কবি এবং কাব্যসৃষ্টি তাঁহার কর্মমাত্র। অপর দশজনের কর্মকে যে চোখে আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখা কর্তব্য। তাঁহার সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার সে ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

এ আপত্তি একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না এবং আপত্তিটিকে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতেছে।

সংসারে সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও ভাগ্যনির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিও তেমনি কর্ম। জেলের মাছ ধরা, চাষার চাষ করা, মুটের বোঝা-বওয়া, কেরাণীর কলম-পেষা ইত্যাদির মত রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা এবং সাহিত্য রচনাও একটি কর্মমাত্র। আর সে কর্ম জগতের কর্মসংজ্ঞায় বা কর্মসভায় সব কর্মেরই সমগোত্র ও সমপংক্তি—ইহা মানিয়া লইতে আমাদেরও আপত্তি নাই। ইহা মানিয়া লইয়াই রবীন্দ্রনাথের কর্ম অর্থাৎ তাঁহার সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলীকে বিচার করা যাইতেছে।

গীতায় আছে, সকলেই কর্ম করে, কারণ কর্ম না করিয়া উপায় নাই, কর্ম করিতে জীব বাধ্য। কিন্তু কর্ম করিলেই কর্মযোগী হয় না, কর্মী আর কর্মযোগী এক নহে। কর্ম করিতে আমরা বাধ্য, তাই কর্ম আমাদের বন্ধন। কিন্তু কর্মযোগীর কর্মবন্ধন বলিয়া কিছু নাই, তাহার কর্ম মুক্তের সহজ কর্ম।

গীতা সিদ্ধ কর্মযোগীর বিশেষ তিনটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। প্রথম লক্ষণটি হইল এই যে, কর্মযোগীর কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, অর্থাৎ সে আসক্তিশূন্য।

দ্বিতীয় লক্ষণ, কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করেন না ; অর্থাৎ তাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই। চাকর যেমন কর্ম করিয়াও কর্তা নয়, কর্মযোগীও তাই।

আর তৃতীয় লক্ষণটি হইল এই যে, কর্মযোগীর সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত বা নিবেদিত।

এই তিনটির যে কোন একটি লক্ষণ যাহার দেখা যায়, সে কর্ম করিয়াও কর্মী নয়, সে কর্মযোগী এবং তাহার কর্ম আর দশজনের মত কর্মমাত্র নহে, তাহা কর্ম-যোগ। আর এই কর্মযোগেই নিখিল সৃষ্টির মহাকর্মের মহানায়কের সঙ্গে সে যোগযুক্ত, সৃষ্টিতে সে ঈশ্বরের কর্মসঙ্গী বা লীলাসঙ্গী। এই কর্মযোগীকেই গীতা বলিয়াছেন—মুক্ত এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষ।

এখন রবীন্দ্রনাথের কর্ম তথা সাহিত্যসাধনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে কর্মযোগের বা যোগীর এই লক্ষণটি কত দূর প্রযোজ্য দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ, কবি রবীন্দ্রনাথ কর্মী না কর্মযোগী, তাহাই এখন দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাশ বৎসরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের 'জীবন বৃত্তান্তে' একস্থানে এই কয়টি কথা লিখিয়াছেন—

"আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনই কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে।"

এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কবিতা তিনিই লিখিয়াছেন, অথচ আসল লেখক তিনি নহেন, অপর একজন, ইহাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। কর্ম করিয়াও গীতার কর্মযোগী নিজে কর্মকর্তা নহে, সেই লক্ষণই কি এখানে অভিব্যক্ত নহে ?

কথাটা রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করিয়াছেন এইভাবে,—

"অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র......তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন যে রচনাকারী আছেন, ...ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কৃতিত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না। সে বাঁশি যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে. তাহার অগোচরে কিছুই নাই॥"

কবি রবীন্দ্রনাথ বাঁশিমাত্র, আসল যিনি কবি তিনিই এই 'কবি বাঁশিটিকে' বাজাইয়াছেন এবং সেই বাঁশিতে যে রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' বলিয়া খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনা তাঁহার হইয়াও তাঁহার নহে, আসল রচনাকারী অপর একজন। কাজেই বাঁশীর মত সেই অচেনার হাতেই তিনি বাজিয়াছেন, কোন কর্তৃত্বই এই রাগ-রাগিণী তথা সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহার নাই, রবীন্দ্রনাথ বলেন। গীতায় কর্মযোগীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন বা লক্ষণই কি এখানে দেখা যায় না? আসল কর্মকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, আর তিনি নিমিত্তমাত্র, এই দৃষ্টিতেই তাঁহার সাহিত্যকর্মকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন এবং তাহাই জানাইতে চাহিয়াছেন।

ইহার পরেই এই কয়টি কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে শুনিতে পাওয়া যায়—

"শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার

লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখন্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন॥"

নিজের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে যে উক্তিটি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই প্রমাণও প্রসঙ্গত রহিয়াছে যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ—যেখানে তিনি বলিয়াছেন 'সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি ইত্যাদি।'

তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ কি মন্ত্রটি উদ্‌যাপন করিতে চাহিয়াছেন, এখন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। সত্তর বৎসর বয়সের পূর্বোক্ত 'প্রতি ভাষণে' তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশোপনিষদের সেই মন্ত্রটি (ঈশাবাস্যামিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥—ব্রহ্মান্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এই সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা বাসিত বা আচ্ছাদিত ইত্যাদি) বারবার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বারবার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ করো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।"

কাব্য সাধনায় এই মহামন্ত্রের সাধনাই—ব্রহ্মসাধনা।

ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় লক্ষ্য বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উপনিষদের একটি মহাবাণী। ছান্দোগ্যো-উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'—তুমিই ব্রহ্ম, এই মহাবাণীর ন্যায় 'ঈশাবাস্য সর্বমিদং' বাণীটিও অন্যতম মহা উপদেশ বলিয়া সাধক ও সিদ্ধসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। উপনিষদের ভাষ্যকারগণও 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'—এই জগতের সর্ববস্তুতে তিনি আছেন বা সর্ব কিছু ঈশ্বর দ্বারা আবরণীয় ও আচ্ছাদনীয় এই ব্রহ্মমন্ত্রটিকে বেদের অন্যতম 'মহাবাণী' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

এই একটি বাণীর মধ্যেই অতীতের তপোবনের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মসাধনা যুক্তভাবে সুগুপ্ত রহিয়াছে, সাধকসমাজে এই সত্য স্বীকৃত। ব্রহ্মসাধনার সেই মহা-উপদেশই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র সাহিত্য সাধনায় উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি সেই সাধনারই সাক্ষ্য—ইহাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমত।

কাজেই আমরা প্রারম্ভেই বলিতে সাহস পাইয়াছি যে, 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষ', এই সত্য প্রমাণের জন্য তাঁহার রচনাবলীকে সন্দেহাতীত সাক্ষ্য বা প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করা আদৌ অযৌক্তিক নহে। দার্শনিকগণ রবীন্দ্র রচনায় এক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলীতে দার্শনিককে নহে এক দ্রষ্টা ও ঋষিকেই পাওয়া যায়—ইহা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাঁহার আপন জীবনবৃত্তান্তে বলিয়া গিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি।

কাজেই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের বিচারে আমরা যদি রবীন্দ্ররচনাবলীর আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করি, তবে তাহা যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত কাজই হইবে। তাহা না করিলেই বরং এ আলোচনা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলী এত বিশাল যে, তাহা হইতে আলোচ্য বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে গেলে বিস্তর সময়ের প্রয়োজন এবং কয়েক খন্ড গ্রন্থেও সে-আলোচনা শেষ করা যাইবে না। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণাদি বক্ষ্যমান ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে না. শুধু 'গীতাঞ্জলি' রচনাটিকে বিচারক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থাপিত করা হইবে।

সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী হইতে একমাত্র 'গীতাঞ্জলি'-কে গ্রহণ করার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' নিছক কবিতা বা কাব্য নহে। তাহা হইলেও 'রবীন্দ্ররচনাবলী' হিসাবেই এই আসরে ইহার প্রবেশ অধিকার থাকিত. পূর্বেই সে আলোচনা আমরা করিয়াছি।

'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধিরই কাব্যময় প্রকাশ বা রূপ বলিয়া আমরা মনে করি। 'গীতাঞ্জলি' কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে. ইহা সাধকের রচনা, যেমন রামপ্রসাদের গান, যেমন কবীর, দাদু প্রমুখদের দোঁহা। 'গীতাঞ্জলি' ঋষি কবির ভজন, তাঁহার সাধন-সঙ্গীত, তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা।

কাজেই নিছক কাব্য সৃষ্টি ইহাকে বলা ভুল, ইহা রবীন্দ্রনাথের ভগবদ উপলব্ধির সাম-গান। গীতার বক্তার ন্যায় গীতাঞ্জলির কবিও বলিতে পারেন—"গীতাঞ্জলি মে হৃদয়ং সুধী, গীতাঞ্জলি মে সারমুত্তমম।"

যে কারণে গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্ররচনাবলী হইতে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ করা হইল, তাহা রবীন্দ্রনাথেরও স্বীকৃত ও অভিপ্রেত। একখানি চিঠিতে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চিঠিখানি যখন তিনি লেখেন, তখনও 'গীতাঞ্জলি' নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হয় নাই। চিঠিখানির তারিখ ৬ই মে, ১৯১৩ ; আর ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁহার নোবেল পুরস্কার সংবাদ এদেশে আসে।

'গীতাঞ্জলি'র এই বিশ্ব স্বীকৃতির বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার এই রচনা সম্বন্ধে চিঠিখানিতে লিখিয়াছেন—

"কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি—এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস—এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।"

গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন, গীতাঞ্জলি তাঁহার সমস্ত সাধনার মূর্তিমান রূপ—স্বয়ং কবির এই সুস্পষ্ট উক্তির পরে গীতাঞ্জলিকে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিবরণরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধিরূপেই আলোচ্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিবার যুক্তি এবং অধিকার দুই-ই আমাদের রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিনা এই প্রশ্নের কি উত্তর গীতাঞ্জলি হইতে পাওয়া যায়, তাহাই অতঃপর যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

এতাবৎ রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে গীতাঞ্জলি একেবারে স্বতন্ত্র ও বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি হইতেই তাঁহার উপলব্ধিসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। পাঠক, শ্রোতা, পত্রপ্রাপক প্রভৃতিকেই তিনি এই বিবরণ পরিবেষণ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে ইহাকে বলা যাইতে পারে অপরের সঙ্গে আলাপ। এই আলাপের আসরে সকলেরই অবারিত দ্বার।

কিন্তু গীতাঞ্জলি ইহা হইতে স্বতন্ত্র। গীতাঞ্জলি জনসভার ভাষণ, সাধারণ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট লিখিত পত্র ইত্যাদি কিছুই নহে। এক কথায়, গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিবরণ নহে, ইহা তাহারও অধিক অন্য কিছু।

গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন।' ইহা আত্মনিবেদন, কিন্তু আত্মনিবেদনের বা আত্মোপলব্ধির বিবরণ নহে। কাহার নিকট রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন ? সে প্রশ্নের উত্তর গীতাঞ্জলিতেই আমরা পাইব।

সত্তর বৎসর বয়সে জন্মজয়ন্তীতে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে এই 'আত্মনিবেদন'-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার যাবতীয় কর্মে এবং কাব্য-সৃষ্টিতে এই ঘোষণাটিই স্পষ্ট—"আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের নিকট আত্মনিবেদনে।"

কে এই পরমপুরুষ ? তিনিই এই পরমপুরুষ, যাঁহার নিকট আত্মনিবেদনেই কেবল মুক্তি সম্ভব হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন মুক্তিদাতা দ্বিতীয় কেহ নাই, আর 'পরম-পুরুষ' শব্দটিও ব্রহ্মবাচক। কাজেই, গীতাঞ্জলিকে 'এ আমার সত্যকার আত্ম-নিবেদন' বলার অর্থ মোটেই অস্পষ্ট নহে,—এক কথায়, ভগবানের নিকট রবীন্দ্র-নাথের আত্মনিবেদনেরই অপর নাম গীতাঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত উপলব্ধিসমূহের বিবরণ আর যাহাই হউক, তাহা ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন নহে তাহা দশজনের নিকট সংবাদ নিবেদন মাত্র। কাজেই উপলব্ধির বিবরণ এবং 'আত্মনিবেদন' তথা 'গীতাঞ্জলি' যে এক শ্রেণীর ব্যাপার নহে, ইহা বিনা তর্কেই আমরা মানিয়া লইতে পারি। উপলব্ধির বিবরণের শ্রোতা বা লক্ষ্য হইলাম আমরা দশজন, আর গীতাঞ্জলির শ্রোতা হইলেন মাত্র 'সেই একজন'। ইহাই হইল সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যেকার উল্লিখিত পার্থক্য।

উপলব্ধির প্রসঙ্গ বাদ দিয়া এখন 'গীতাঞ্জলি'র প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে এবং 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে বক্তব্য একটু পরিষ্কার ও বিশদ করা যাইতেছে।

গীতাঞ্জলি সম্পর্কে প্রারম্ভেই আলোচনায় এইরূপ একটি অভিমত আমরা ব্যক্ত করিয়াছি যে, গীতা যদি ভগবানের 'মে হৃদয়ং পার্থ' হয়, তবে গীতাঞ্জলিকেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'মে হৃদয়ং' বলা যাইতে পারে। 'গীতা ও গীতাঞ্জলি'—নামক একটি প্রবন্ধে পূর্বে এই বিষয়ে যে-আলোচনা করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহা হইতে কিছুটা উদ্ধৃতি অসঙ্গত হইবে না। সেখানে এক স্থানে এই কথা বলা হইয়াছে—

"গীতা ও গীতাঞ্জলির মধ্যে নামসাদৃশ্যের ন্যায় একটি রূপ-সাদৃশ্যও বর্তমান। গীতাকে ভগবান বলিয়াছেন তাঁহার বাঙ্ময়ী রূপ, গীতাঞ্জলিকে বলা চলে ভক্তের সুরময়ী রূপ। গীতাকে বলা হইয়াছে ভগবানের হৃদয়-রস, গীতাঞ্জলিও তেমনি ভক্তের হৃদয়-রস। গীতার বক্তা ভগবান—শ্রোতা ভক্ত। আর গীতাঞ্জলির গায়ক ভক্ত—শ্রোতা ভগবান। ভগবান শুনাইয়াছেন—গীতা, ভক্ত শুনাইয়াছেন—গান। ভক্ত না থাকিলে গীতা ব্যর্থ, ভগবান না থাকিলে গীতাঞ্জলি মিথ্যা।"

ইহার সঙ্গে এখন সামান্য আর একটু যোগ করা যাইতেছে। আঠারো অধ্যায়ের গীতা শুনাইয়া শেষে আসিয়া সমস্ত গীতার সারমর্ম শ্রীভগবান তাঁহার 'পরম-গুহ্যতম বচনং মে' বলিয়া জানাইয়াছেন,—'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমার শরণ লও। তাহারই প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের যে-আত্মনিবেদন তাহাই গীতাঞ্জলি।

গীতাঞ্জলিকে সাক্ষ্য হিসাবে বিচার্য ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার পটভূমিকাটুকু যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রস্তুত করা হইল।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মোপলব্ধির বিচারক্ষেত্রে একমাত্র উপনিষদেরই আশ্রয় বা সাহায্য আমরা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম'-প্রসঙ্গে উপনিষদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া প্রধানত আমরা মান্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গীতাঞ্জলির ক্ষেত্রে উপনিষদ প্রকৃতই কোন কাজে আসিবে কিনা, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়াই অনেকের মনে হইবে। কারণ, গীতাঞ্জলিকে আমরা বলিয়াছি ভক্তের গান, যে-গানের শ্রোতা স্বয়ং ভগবান।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে আমরা 'ভক্তি'-র সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদের বিচার্য হইল রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞান, আর রবীন্দ্রনাথের ভগবানে ভক্তি তথা ব্রহ্ম-ভক্তিকেই গীতাঞ্জলির মাধ্যমে আলোচ্যক্ষেত্রে আমরা আনিয়া ফেলিয়াছি।

ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু ব্রহ্মভক্তির কোন প্রকাশ বা উল্লেখ উপনিষদে আছে কিনা, তাহাই এখন আমাদের অবশ্য বিচার্য এবং সেই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান কর্তব্য। নতুবা গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গে বা বিচারে উপস্থিত করিবার কোন সুযোগই আমাদের থাকে না। যথাসাধ্য সংক্ষেপেই আলোচনাটুকু শেষ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

উপনিষদকে ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। জিজ্ঞাসা বলিতে জানা বা জ্ঞানের কথাই বুঝাইয়া থাকে। তাই দার্শনিকগণ উপনিষদকে জ্ঞানশাস্ত্র বলেন। আর ভক্তি বলিতে ভগবানের সঙ্গে হৃদয়ের বিশেষ একটি সম্পর্ককে বুঝাইয়া থাকে। কিম্বা ভক্তি বলিতে মনের একটি বিশেষ অবস্থাকেই বুঝাইয়া থাকে। সাধারণত ভক্তিশাস্ত্র বলিতে উপনিষদকে বুঝায় না, বুঝায় মহাভারত, গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিকে।

কাজেই ভক্তির প্রসঙ্গে উপনিষদকে প্রমাণরূপে গ্রহণের প্রচেষ্টা অসঙ্গত ও ব্যর্থ বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উপনিষদই ভক্তির মূল উৎস এবং ঔপনিষদিক প্রেমতত্ত্বই পূর্বোক্ত ভক্তিশাস্ত্রসমূহে বিশদ করা হইয়াছে মাত্র। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এখন কয়েকটি দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক নামক প্রাচীনতম উপনিষদে বলা হইয়াছে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ

প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"—যেহেতু এই আত্মা অন্তরতর, অন্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষা নিকটতর, সেই হেতু ইহা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমুদয় হইতে প্রিয়।"

আত্মা বা ব্রহ্মকে সর্বকিছু হইতে প্রিয় বলার অর্থ, ইনিই "প্রিয়তম"। ব্রহ্মই প্রিয়তম—ইহাই হইল বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদেশ এবং প্রিয়তমের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক, তাহারই নাম প্রেম। ব্রহ্ম বা ভগবানই যে প্রিয়তম এবং প্রিয়তমের জন্য জীবহৃদয়ের প্রেম যে কি বস্তু বা রস, তাঁহারই পরিচয় গীতাঞ্জলি বহন করিয়া থাকে।

ইহার পরেই পূর্বোক্ত উপনিষদের এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত'—আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে।

এখানেও পূর্বের ন্যায় বলিয়া রাখা যাইতেছে যে, আত্মাকে বা ভগবানকে প্রিয়রূপে পূজা, ভজন, বন্দনা, আস্বাদন ইত্যাদিরই প্রকাশরূপ গীতাঞ্জলি।

অতঃপর বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদিষ্ট প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম কথাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন—

জগতে পতি, পত্নী, পুত্র, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি আমাদের প্রিয় হয় কেন? কেনই বা জগৎ এবং তাহার বস্তুসমূহ প্রিয় বোধ হয়? ইহারা কেহই ইহাদের নিজেদের গুণে বা ধর্মে আমাদের প্রিয় হয় না। সর্বপ্রিয়তম যে আত্মা তিনিই ইহাদের সকলের অভ্যন্তরে বা অন্তরে রহিয়াছেন, তাই ইহারা প্রিয় হইয়া থাকে, "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"—আত্মারই কামনায় এই সর্বকিছু প্রিয় হইয়া থাকে॥

প্রিয়তম এই আত্মা সর্ববস্তুতে সর্বরূপে কিভাবে প্রিয়-প্রকাশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই প্রিয় রসাস্বাদন গীতাঞ্জলি, পূর্বের ন্যায় এখানেও উল্লেখ করা যাইতেছে।

অন্যভাবেও ঔপনিষদিক ভক্তি বা প্রেমতত্ত্বকে দেখা যাইতে পারে। জীবের মুক্তি কামনা রহিয়াছে, মোক্ষের প্রয়াস রহিয়াছে; অপরদিকে এই মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদির জন্য জীবের প্রতি ব্রহ্মের আকর্ষণও রহিয়াছে। নতুবা মুক্তি, মোক্ষ, যোগ ইত্যাদি অর্থহীন হইয়া পড়ে। জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের প্রতি জীবের প্রেম, ইহা সত্য বলিয়াই মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদিও সত্য ও সম্ভবপর হইয়া থাকে। এইজন্যই উপনিষদে ঋষির প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়; রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ইত্যাদি॥

প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে একই দেহবৃক্ষে ব্রহ্ম এবং জীবকে সখ্য সম্পর্কে যুক্ত দুইটি পক্ষী বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে পিতা, মাতা, সখা, প্রিয়তম ইত্যাদি উপদেশে ভক্তি এবং প্রেমতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে, 'রসস্বরূপ, এই রসস্বরূপকে পাইয়াই তবে জীব আনন্দিত হয়।'

এই রস-স্বরূপ, এই প্রিয়তম ব্রহ্ম বা ভগবানের সঙ্গে জীবের যে প্রেমসম্পর্ক, তাহারই অত্যুজ্জ্বল রসমূর্তি গীতাঞ্জলি, একথাও শুধু উল্লেখ করিয়া রাখা গেল।

গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন যে উপনিষদেরই উপদিষ্ট ব্রহ্ম সম্পর্কে, তাহার প্রমাণ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিসমূহেই পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি উপনিষদেরই উপদেশ, ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং গীতাঞ্জলিকে এই ভক্তি, প্রেম ইত্যাদিরই উজ্জ্বল রসরূপ বলিয়া আমরা অভিহিত করিয়াছি। কাজেই গীতাঞ্জলিকে আলোচ্য ক্ষেত্রে সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিবার আদেশ উপনিষদের উপদেশেই আমরা পাইতেছি।

অপর একটি অসুবিধার কথা এখন উল্লেখ করা যাইতেছে—

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলও জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রার কোন চিত্র পাওয়া যায় না। ব্রহ্মকে জানার পর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চরিত্রচিত্র কিরূপ হইয়া থাকে, সে-বিবরণ মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদি শাস্ত্রেই বিশদভাবে পাওয়া যায়, উপনিষদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

অবশ্য, ব্রহ্মজ্ঞের জীবনের মূল সূত্রগুলি উপনিষদেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বড় জোর তাঁহাদের জীবনের স্বরলিপি মাত্র, তাহা তাঁহাদের জীবন-সঙ্গীত নহে। বাড়ির নক্সা হইতে একটা বাড়ি যে নির্মাণ না করা যাইতে পারে, এমন নহে। কিন্তু উপনিষদ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনসূত্র লইয়া রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ গড়িতে পারে, এমন স্রষ্টা বিশ্বকর্মা সুদুর্লভ। এই বিষয়ে মহাভরত, ভাগবত, পুরাণাদিতে যে-চিত্র পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশ্রয়।

গীতার উপদেশ হইতে যেমন ভগবানের জীবন-চরিত্র অঙ্কিত করা চলে না, উপনিষদের ব্রহ্ম উপদেশ বা ব্রহ্ম সূত্র হইতেও তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির জীবনকাহিনী অঙ্কিত করা সম্ভব নহে, ইহাই আমরা বলিতে চাহিয়াছি।

প্রামাণ্য উপনিষদ কয়খানির মধ্যে একমাত্র তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের একটি রেখাচিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেই চিত্রটি এই—

"ইমাঁল্লোকান কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সামগায়ন্নাস্তে হাউ বু, হাউ বু, হাউ বু॥—পরিশেষে যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিব্যাদি লোকে পর্যটন করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্তন করত আহা-আহা-আহা এই শব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময় প্রকাশপূর্বক অবস্থান করেন॥"

বিশেষভাবে এই পরম বিস্ময়ের ও ব্রহ্মবন্দনারই বাস্তব প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। অতীতের ঋষির এই ঔপনিষদিক চিত্রখানিই বর্তমানকালে গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ।

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এতক্ষণ যাহা বলা হইল, সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গীতাঞ্জলিকে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, এক ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিই এখানে ব্রহ্মানন্দে ও বিস্ময়ে গান গাহিয়া গিয়াছেন—হা৩ বু হা৩ বু হা৩ বু—আহা-আহা-আহা। ইহা মনে রাখিয়া গীতাঞ্জলির যে কোন একটি গান গ্রহণ করিলেই পাঠক আমাদের অভিমতের পূর্ণসমর্থন তাহাতে দেখিতে পাইবেন।

গীতাঞ্জলিকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখিলে তিনটি তত্ত্বই বিশেষ-ভাবে অভিব্যক্ত দেখা যাইবে—প্রথম, অহংকারকেই ভগবানের সঙ্গে মিলনের প্রধান অন্তরায়রূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন। আমিকে বুঝাইতে অহং এবং আত্মা এই দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অহং-টি মিথ্যা আমি এবং আত্মাই আমার প্রকৃত আমি—ইহা সর্বোপনিষদের উপদেশ।

দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি গীতাঞ্জলিতে পাওয়া যায় তাহা হইল এই যে, দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ ভগবানের দূত বলিয়া জানিয়াছেন। উপনিষদে সমস্ত কিছুকে ভগবানেরই দান বলা হইয়াছে এবং ভগবানকে বলা হইয়াছে বসুদান, আর রবীন্দ্র-নাথ দুঃখের এই দানকেই দেখিয়াছেন প্রেমময়ের দূতীরূপে।

গীতাঞ্জলির তৃতীয় তত্ত্বটি হইল এই যে, সর্বত্রই ভগবানের সত্ত্বা ও লীলা। উপনিষদ বলিয়াছেন ঈশাবাস্য সর্বমিদং এবং এই সৃষ্টি তাঁহার আনন্দরূপ অর্থাৎ লীলা।

এখন গীতাঞ্জলির কয়েকটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতেছে। তার আগে আর

একবার রবীন্দ্রনাথের কথা কয়টি স্মরণ করিয়া লওয়া যাক—"কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি—এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ—এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।"

'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে এবং প্রমাণ হিসাবে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র হইতেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইবে, কারণ, অধিক উদ্ধৃতি বাহুল্য।—

গীতাঞ্জলিতে একটি গানে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামী। এই অন্তর্যামীই রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দেবতা'। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি হইল যে, তাঁহার মধ্যেই তাঁহার অন্তর্যামীরূপে ভগবানের এই অবস্থিতি কেন? কি তিনি চাহেন?

উপনিষদে পাওয়া যায় যে, তিনি অগ্রে একা ছিলেন, এই একাকিত্বে নিজেকে নিজে সঙ্গ দিবার উদ্দেশেই তিনি 'বহুস্যাম'—বহু হইয়াছেন। অর্থাৎ আপন সৃষ্টিতে তিনি আপনিই ভোক্তা-ভর্তা-দ্রষ্টা-অনুমন্তা ইত্যাদিরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের নিকটেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসাটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়াছেন—

আমার নয়নে তোমার বিশ্ব-ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান?

উপনিষদের একটি উপদেশে আছে,—

"হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই সম্ভজনীয় আত্মাকে ইন্দ্রিয় সমুদয় উপঢৌকন প্রদান করে॥" প্রজারা যেমন রাজাকে ভেট দেয়, ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ অন্তর্যামী আত্মার আনন্দ বিধানে সর্বদা তৎপর—ইহাই হইল উপদেশটির অর্থ।

উপনিষদের উপদিষ্ট এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথের আপন জীবনে একটি প্রশ্নে অপূর্ব সুন্দর রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে—'হে মোর দেবতা ইত্যাদি।'

জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়াছেন—

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধুকান্ডে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—

"অগ্রে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট)রূপেই ছিলেন—আত্মৈবেদগ্র আসীৎ পুরুষবিধ।" সেই একাকী ভয় পাইলেন, 'এইজন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়॥'

তারপর সেই প্রথম পুরুষ বা বিরাট-পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'সবে নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ'—তিনি মোটেই রতি বা আনন্দ লাভ করিলেন না। এইজন্য (আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না। তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন॥

কেন? রতি বা আনন্দলাভ করিবার জন্য। পরম একাকী আপন একাকিত্বে নিজের আনন্দ-সঙ্গী পাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিতে জীবহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট, ইহাই হইল উপনিষদের উপদেশ।

উপনিষদের এই সত্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে ও উপলব্ধিতে কতখানি সত্য প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলার ভঙ্গী ও ভাবেই তাহা অভিব্যক্ত। উপনিষদ শুধু একটি সংবাদসূত্র দিয়াছেন, একাকীরই এই সৃষ্টি। আর রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই সংবাদটিই রূপান্তরিত হইয়া সংবাদের বাচকের মধুময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যে, গান-জানা এবং গান-গাওয়া এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উপনিষদের উপদেশ এবং রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও সেই পার্থক্য। এটুকু মনে রাখিলে গীতাঞ্জলির উদ্ধৃত অংশ কয়টির ব্যাখ্যা বা ভাষ্য হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

আরও একটি কথা, তত্ত্বে ও রসে যে পার্থক্য, উপনিষদের উপদেশে ও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে সে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ—তিনি রস-স্বরূপ' এবং তাঁহাকে পাইলে 'আনন্দী' হাওয়া যায়। এই 'রসো বৈ সঃ—এর

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যে রস সম্পর্ক, তাহাই বিগলিত হইয়া গীতাঞ্জলিতে আকার গ্রহণ করিয়াছে।

এই রস সম্পর্কে বা বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভক্ত, কখনো সেবক, কখনো বন্ধুসখা, কখনো পুত্র, কখনোবা প্রিয়। নানারূপে ও ভাবে রবীন্দ্রনাথের এই 'আনন্দী' রূপটি গীতাঞ্জলিতে মূর্ত হইয়াছে।

একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মেনেছি, হার মেনেছি।' তাঁহার অন্তর্যামীর সঙ্গে কোন্ খেলাতে তিনি এই হার স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়—

আমার চিত্ত গগন থেকে
তোমায় কেউ রাখবে ঢেকে
কোনমতেই সইবে না সে
বারে বারেই জেনেছি।

এখানে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় আকাশে কোন কিছুতেই সেই প্রিয়তম সেই অন্তর্যামীকে ঢাকা বা আবৃত করা যাইতেছে না। এ কী অদ্ভুত লীলা ভগবানের! আর এ কী আশ্চর্য রস-অভিযান ভক্তের!

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

মেনেছি, হার মেনেছি।
ধরা দিলেম তোমার হাতে,
যা আছে মোর এই জীবনে
তোমার দ্বারে এনেছি॥

উপনিষদের অঙ্কিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে এক রেখাচিত্র দেখা গিয়াছে—হাত বু, 'অহো-অহো-অহো', এই পরম বিস্ময়-গানে উন্মত্তের ন্যায় তিনি ভুবনে বিচরণশীল। এই হাত বু হাত বু, এই পরমবিস্ময়—ইহার যে কত রূপ ও কত রসপ্রকাশ সম্ভবপর, গীতাঞ্জলিই তাহার প্রমাণ। যথেচ্ছ যে কোন একটি গান গ্রহণ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে। একটা গান লওয়া যাক—

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই

কৃপা করে রেখেছ নাথ,
অনেক ব্যবধান—

বিরহ ব্যবধানের সুরটি এখানে বেশ স্পষ্ট এবং এই ব্যবধানকে প্রেমমুগ্ধ হৃদয় তাঁহার কৃপা বলিয়াই গণ্য করিয়াছে, দেখা যায়। এখন আর একটি গান লওয়া যাক—

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত।

তিনি ছিলেন খেলার সাথী, সখা, বন্ধু, কাজেই লজ্জা-ভয়-চিন্তা-জিজ্ঞাসা ইত্যাদির কিছুমাত্র অবকাশ সেখানে ছিল না। কিন্তু কে এই খেলার সাথী? কে এই সখা?—

হঠাৎ খেলার শেষে কী দেখি ছবি—
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত॥

যাঁহার সংগে ব্যবধান ছিল প্রেমেরই ব্যাখ্যা, তিনিই হইলেন একেবারে খেলার সাথী, এখন খেলা শেষে দেখা গেল—তিনিই বিশ্বভুবনের ঈশান, বিধাতা।

এই গানটিতে উপনিষদের ঋষির এক শান্ত মূর্তি প্রতিফলিত দেখা যাইবে—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অকল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই, প্রয়োজনও করে না। ইহার পরে যে কথাটি তিনি বলিয়াছেন, উপনিষদের কম ঋষির কণ্ঠেই এমন বাণী ধ্বনিত হইয়াছে—

দিকে দিকে টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি আনন্দ হইতে আসিয়াছে, আনন্দে বিধৃত এবং আনন্দেই পরিণামে অবসিত। কিন্তু সৃষ্টিকে একমাত্র মহর্ষি

যাজ্ঞবল্ক্যই বলিয়াছেন, 'মূর্তানন্দ'। রবীন্দ্রনাথের মুখে সেই পরম বাণীই শোনা গিয়াছে যে, এই সৃষ্টিই আনন্দ, এই সৃষ্টি আর কিছু নহে—'মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ।'

ইহার পরের উক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও প্রণাম এক সঙ্গেই পাওয়া যায়—

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।

উপনিষদের ঋষির প্রার্থনা ছিল—হিরণ্ময় জ্যোতিতে সত্যের মুখ আবৃত, সেই আবরণ অপসৃত হউক, যত্তে রূপং কল্যাণতম তত্তে পশ্যামি। আর সত্যের কল্যাণতম দক্ষিণ মুখটি এখানে অনাবৃত, তাই সত্যের মুখ দেখিবার প্রার্থনা নাই, আছে শুধু চরণে পরিপূর্ণ একটি প্রণামে আত্মনিবেদনে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই, আর উদ্ধৃতির শেষও যে অসম্ভব। পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতাঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয় রস। এ রস অন্তহীন অশেষ, এ রস গভীর অতল। ভক্ত ও ভগবানের বাসর-ঘরের এই নিভৃত লীলা, সীমা ও অসীমের এই অনন্ত রস কৌতুক, আত্মা ও পরমাত্মার এই মিলন-বিরহ—ইহার আদিই বা কোথায়? ইহার অন্তই বা কোথায়?

আর তাহাকেই ব্রহ্মের লীলাসঙ্গী রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির শুভ্র অঞ্জলিতে ভরিয়া রাখিয়াছেন, যেমন শিবের দুই নেত্রের কমন্ডলুতে নিখিল ভাস্বর জ্ঞান জ্যোতি এবং নিখিল আনন্দ প্রেম কল্যাণ বিধৃত। এই কারণেই গীতাকে বলিয়াছি—শুধু তত্ত্ব, আর গীতাঞ্জলিকে বলিয়াছি—রসো বৈ সঃ।—উদ্ধৃতি অনন্তকালেও যে শেষ হইবার নহে।

উপনিষদে অঙ্কিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের রেখাচিত্র দেখিয়াছি—অহো-অহো-অহো বিস্ময় উন্মাদ। আর ভক্তিশাস্ত্রের বেদগ্রন্থ ভাগবতে মহাব্রহ্মজ্ঞের ভক্তরাজরূপ-চিত্রটি পাই দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্রে। সে চিত্রটি এই—

কবচিদ্ রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তা-শবল চেতনঃ।
কবচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহলাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥
..........ইত্যাদি॥

—প্রহ্লাদ কখন ভগবানের চিন্তায় আকুল চিত্তে রোদন করিত, কখন তাঁহার মিলনানন্দে হাস্য করিত, কখন গান করিত, কখন মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিত, কখন

নির্লজ্জের ন্যায় নৃত্য করিত, কখন বা ভগবানের সংস্পর্শ সুখে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রগাঢ় প্রণয়ানন্দে সুখ-অশ্রুতে সিক্ত ও মুদিত চোখে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিত।

মহাব্রহ্মজ্ঞ ভক্তরাজ প্রহ্লাদের এই চরিত্রের সব কয়টিরই রসচিত্র বা রসপ্রকাশ গীতাঞ্জলিতে পাওয়া যাইবে। কৌতূহলী পাঠক একটু মিলাইয়া পাঠ করিলেই এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তরাজ পুরুষ, ইহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না।

একটি গান উদ্ধৃত করিয়া গীতাঞ্জলির আলোচনার উপসংহার করা যাইতেছে। গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের একটি চরম অভিলাষ জানাইয়া বিদায় লইয়াছেন। এই বিদায়-অভিলাষ কোন্ পুরুষের, তাহাও গানখানিতেই জানা যাইবে—

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা জেনেছি
তুলনা তার নাই।

এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি,
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।

পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

কি তিনি জানাইয়া গিয়াছেন, সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই আমাদের শান্ত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, এই একটিমাত্র কথাই রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ভরিয়া নানাভাবে জানাইয়া গিয়াছেন।

যেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, উপসংহারে আসিয়া সেখানেই যাত্রা শেষ করা যাইতেছে।—

একটা প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ইহা প্রমাণ করা চলে কিনা। ইহা প্রমাণ করা স্বভাবতই অসম্ভব, এই মূল সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াই এই বিষয়ে একটা প্রচেষ্টা করা গিয়াছে।

ব্রহ্মের অস্তিত্বই কেহ প্রমাণ করিতে পারে না। সাংখ্যশাস্ত্র তো পরিষ্কারই রায় দিয়াছেন যে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। বস্তুতঃ কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, আমার জানা বা না-জানার উপর একটি ধূলিকণাও নির্ভর করে না, কারণ অস্তিত্ব মাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ।

ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না, ইহা একটা সমস্যা হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির নিকট এই সমস্যাটি আছে বলিয়াই যে 'ঈশ্বর-নাস্তি' হইবেন, ইহা কুযুক্তি। ঈশ্বর আছেন, ইহা প্রমাণ করা যায় না ; তবু ঈশ্বর আছেন,—ইহা যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে জানেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলা হয়। এমন যে সাংখ্যশাস্ত্র, প্রমাণের অভাবে যেখানে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলিয়া বাতিল করা হইয়াছে, সেখানেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

এই আত্মা সম্পর্কে প্রমাণের প্রয়োজন বা প্রশ্ন উঠে না, কারণ কেহই বলেন না যে, তিনি নিজে নাই। নিজের অস্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা নাই, ইহা প্রমাণ করিতে

হইলেও প্রারম্ভেই নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। দেখা যায় যে, আত্মার অস্তিত্ব এমনই একটি ব্যাপার, যাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, বরং কোন কিছু প্রমাণের পূর্বে যাহার অস্তিত্ব স্বীকৃতিরই প্রথম অপেক্ষা করে। এক কথায় —আত্মা স্বতঃসিদ্ধ।

আমি আছি, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং এই আমিই আত্মা। এখন প্রশ্ন থাকে, এই 'আমি' বা আত্মা আসলে কি? এই আমি-র আসল রূপ অর্থাৎ স্বরূপ জানিতে গিয়াই যেখানে ঋষিগণ উপনীত হইয়াছেন—তিনিই ব্রহ্ম। এই স্তবঃসিদ্ধ আত্মারও তিনিই আশ্রয়।

আত্মাই যদি স্বতঃসিদ্ধ হন, তাঁহার অস্তিত্বই যদি প্রমাণের কোন অপেক্ষা না রাখে, তবে সেই আত্মারই যিনি আশ্রয়, তাঁহার সম্পর্কে প্রমাণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবং সে প্রমাণ-প্রচেষ্টারও কোন অর্থ হয় না। কাজেই, ব্রহ্ম আছেন, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলেও তিনি যে আছেন, ইহা মানিতে আমরা বাধ্য।

তাঁহাকে প্রমাণ করিতে না পারিলেও তাঁহাকে জানিতে আমরা পারি। তাঁহাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি। রবীন্দ্রনাথও সেই ঋষি, ইহা প্রথমে মানিয়া লইয়াই পরে প্রমাণের প্রচেষ্টায় আমরা ব্রতী হইয়াছিলাম।

প্রচেষ্টার প্রথম পাদেই দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম যে আছেন, ইহাই প্রমাণ করা যায় না। আর সেই ব্রহ্মকে কেহ জানিয়াছেন কি না, ইহা আমরা প্রমাণ করিব কি উপায়ে?

এই বিপদ বা সমস্যা উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বিশেষ একটি পথ আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হইয়াছে—সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিশ্লেষণ। এই উপলব্ধিকে একমাত্র উপনিষদের কষ্টিপাথরে ঘষিয়াই আমরা ইহার বিচার ও মূল্য নির্ধারণ করিয়াছি। সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য—এই পথই আমরা অনুসরণ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ব্যতীত অপর কোন কিছুকে সাক্ষ্য হিসাবে বিচার ক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত করি নাই, একমাত্র গীতাঞ্জলি ছাড়া।

গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনার বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকেও সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করিবার

অধিকার এবং সুযোগ দুই-ই আমাদের ছিল, তাহারও যুক্তি আমরা দেখাইয়াছি, যদিও কার্যকালে রবীন্দ্র-রচনাবলী বিচারক্ষেত্রে আনীত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি, ইহা প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার দায়িত্ব আমাদের নহে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ইহাই আমরা ঘোষণা করিয়াছি এবং ঘোষণার সমর্থনে প্রমাণ ও যুক্তিও কিছু উপস্থাপিত করিয়াছি। আমাদের কর্তব্য এবং প্রচেষ্টা এই পর্যন্তই।

ইহার পরেও যে প্রশ্ন, আলোচনা ইত্যাদি দেখা দিবে, আমাদের দিক দিয়া তাহা অবান্তর। অবশ্য, আমাদের প্রদত্ত প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদির অবকাশ নিশ্চয়ই রহিয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার পাই। তবু তাহা আমাদের দিক দিয়া বাহুল্য, কারণ আমাদের প্রচেষ্টা ও কর্তব্যের যেখানে স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি, সেখানেই আসিয়া আমরা উপনীত হইয়াছি। অতঃপর শক্তিমান ও অধিকারী পুরুষগণ ইহার পরেও অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমরা কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—এই কথাটিই শুধু আমরা উপস্থিত করিয়াছি। মনীষী পুরুষগণ কথাটিকে তাঁহাদের বিচার ও আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিবেন, ইহাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই কথাটি যথাশক্তি এবং যথাসংক্ষেপে পেশ করিবার পর আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।—

উপসংহারে বিশেষ একটি বিষয়ের আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। আলোচ্য বিষয়টি অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক নহে, তবুও না তুলিলে কোন ক্ষতি ছিল না। তথাচ বিষয়টি যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে না।

আমাদের আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর অনেকেই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতজীবন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন কি?

বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, মুক্তপুরুষ, মহাপুরুষ, মহাযোগী ইত্যাদি বলিতে প্রশ্নকর্তাদের মনে যে ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন তাহার সঙ্গে খাপ খায় না, ইহাই তাঁহাদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ' এই ঘোষণার কোন ইতরবিশেষ ঘটে না। ঘরের সব কয়টা বাতি সাদা আলো দেয়

বলিয়াই যে লাল বাতিটাকে আলো বলা চলিবে না, প্রশ্নকর্তাদের মনোভাব যেন কতকটা এইরকম।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রার কোন ধরা-বাঁধা ছক্ নাই। রাজর্ষি জনক, আর নগ্ন উন্মাদ-বৎ বিচরণশীল শুকদেবের জীবনযাত্রার মধ্যে তো কোন মিল নাই। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এবং স্বয়ং ব্রহ্ম রামচন্দ্রের জীবনযাত্রায় কেহ সাদৃশ্য বা মিল খুঁজিয়া পাইবেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহর্ষি দুর্বাসা, এই উভয়ের জীবনধারার মধ্যে সাদৃশ্য বা সঙ্গতি অন্বেষণ করা বৃথা।

উপনিষদের ঋষি বলিতে শান্ত সৌম্য এক জীবন-চিত্রই চোখে ভাসিয়া উঠে। তাহার বিপরীত জীবনযাপন কি ব্রহ্মজ্ঞের দেখা যায় না? একখানি উপনিষদের, যতদূর মনে পড়ে হয়তো জাবাল-উপনিষদের, এক ভাষ্যে এইরূপ উল্লেখই দেখিয়াছি, —"ভগবান দত্তাত্রেয় মদিরা এবং স্ত্রী সেবন করিতেন।" এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং তাহাতে দেখা যাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের জীবন-যাত্রা বিভিন্ন এবং বিচিত্র, এমন কি বিপরীত।

আধুনিক কালে আসিলেও এই একই ব্যাপার পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞানাবতার শঙ্কর এবং প্রেমাবতার চৈতন্যদেব উভয়ের জীবনযাত্রা একই ধরণের, এমন কথা কেহ বলিবেন না। সিদ্ধযোগী এবং সিদ্ধতান্ত্রিক উভয়ের জীবনযাত্রা একেবারে বিপরীত। আবার, ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ কর্মযোগী এই তিনের জীবনধারা পরস্পর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপ।

কাজেই, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, কিংবা কাহারও নিজস্ব ধারণার সঙ্গে যদি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার কোন সাদৃশ নাই থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি? আর তাহাতে আশ্চর্য হইবারই কি এমন আছে?

শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গুটিছয়েক প্রকৃতি বা রকমের উল্লেখ আছে, যথা—শান্ত, জড়, উন্মাদ, পিশাচ ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে কেহ বা শান্ত, কেহবা একেবারে জড়বৎ, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, কেহ বা পিশাচবৎ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কাজেই বলা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা যে ধরণের বা প্রকৃতিরই হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের কোন ইতরবিশেষ ঘটে না।

এতক্ষণ এই কথাটাই আমরা বলিতে চাহিয়াছি যে, আচরণ দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষকে চেনা বা জানা কদাচ নৈব নৈবচ। সৎপুরুষ, সাধুপরষ, শক্তিমান-সাধক প্রভৃতিকে তাঁহাদের আচরণ হইতে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু কোন ব্রহ্মজ্ঞই তাঁহার

আচরণে ও ব্যবহারে কদাচ ধরা পড়েন না। কেন? উত্তরটা স্পষ্টতঃ না দিলেও একভাবে আভাসে এতক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। এখন স্পষ্টভাবে উত্তরটা দেওয়া যাইতেছে।

আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদির সংগে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের যথার্থ কোন যোগ নাই। ব্যক্তিই তাহার আচরণে ব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্যক্তি নহেন। কারণ, ব্যক্তিত্বের নিঃশেষিত বিলোপ না ঘটিলে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া চলে না।

ব্রহ্মজ্ঞের যে-ব্যক্তিত্ব তাহা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে বাহির হইতে চিনিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, অন্ততঃ তাঁহার আচরণে পাওয়া যায় না। খুব সজাগ ও সতর্ক থাকিলে একটি মাত্র লক্ষণ ধরা দিয়া থাকে. তাহা হইল এই—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 'অহং' পরিদৃষ্ট হয় না, না আচরণে না কথাবার্তায়।

আর একটি কথা আছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য ইত্যাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাঁহাদের নিকট ন্যায় ও অন্যায়, ভালোমন্দ, ইত্যাদি সমস্তই সমান অথবা এক। কিন্তু আচরণে তাঁহারা কখনো ক্ষেত্র-ধর্ম লংঘন করেন না দেখা যায়।

আচার্য শংকর তাঁহার শারীরকভাষ্যে একস্থানে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে. ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্বান (ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এবং অবিদ্বানে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ, সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ, ব্যবহার আর দশজন লোকেরই মত. ইহাই হইল আচার্য শংকরের সিদ্ধান্ত।

আচরণ দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ বাছাই বা সনাক্ত করা হাস্যকর বালসুলভ চিন্তা বা চেষ্টা মাত্র। আচরণ দেখিয়া যদি ব্রহ্মকে ধরা যাইত. তবে ঢেউ ধরিয়া সমুদ্রকে পারে টানিয়া আনা যাইত। অগণিত গ্রহ-উপগ্রহের প্রচন্ড ঘূর্ণি বা আবর্তনে যেমন আকাশের বুকে কোন দাগ কাটে না বা রাখে না, সংসার বা তাহার ব্যবহারও তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ-চরিত্রে কোন দাগ কাটে না। অগণিত গ্রহ-উপগ্রহকে বুকে স্থান দিয়াও যেমন আকাশ স্থির, স্বতন্ত্র ও পৃথক. বহু ও বিচিত্র আচরণকে আশ্রয় দিয়াও ব্রহ্মজ্ঞের জীবন মুক্ত, অস্পৃষ্ট ও পৃথক। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহে থাকিয়াও বিদেহী। দেহের আচরণ দ্বারা বিদেহীকে কখনও কেহ ধরিতে পারে না, যদি না তাঁহারা কৃপা করিয়া ধরা দেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সম্ভাব্য সর্বরকম অভিযোগ মানিয়া লইয়াই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি

যে, রবীন্দ্রনাথের আচরণ যদি ধর্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ দেখাইতেও পারেন, তথাপি 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ' এই সত্যের কোন ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলে না, এই অর্থহীন প্রশ্নটিকে স্বীকার করিয়াই এতক্ষণ আলোচনা করা গিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ' বলিয়া উল্লেখ ও প্রয়োগ উপনিষদেই রহিয়াছে।

কাজেই, প্রশ্নটিকে ঠিকমত আকার দিলে আলোচনার একটা অবকাশ থাকে। আচরণ দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ চিনিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন হওয়া উচিত—ব্রহ্মজ্ঞদের জীবনযাত্রা বা আচরণে এমন পার্থক্য কেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন যতটা প্রযোজ্য হইতে পারে, আলোচনার ক্ষেত্রের পরিধি সেই অবধি সীমাবদ্ধ রাখিয়া একটু অগ্রসর হওয়া যাইতেছে।

ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথকেও সাধারণ মানুষের ন্যায় আসক্ত হইতে, আচ্ছন্ন হইতে এবং বিচলিত হইতে দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের আচরণে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শান্তির বিলক্ষণ অভাব প্রায়শ বা কখনো কখনো দেখা গিয়াছে, ইহা সত্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইতেছি।

ইহা মানিয়া লইলে তারপরও কি বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি? আমাদের উত্তর, হ্যাঁ, ইহা মানিয়া লইলেও দ্বিধাহীন অকুণ্ঠভাবেই বলা চলে—রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি। কেন চলে, সেই আলোচনাই সংক্ষেপে শেষ করিয়া 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের উপর যবনিকাপাত করা যাইতেছে।

'ব্রহ্মসূত্রে' ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধে ভগবান বেদব্যাস প্রথমে একটি সূত্রে বলিয়াছেন, "ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ"—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে পরজন্মে প্রতিবন্ধ দূর হইলে লাভ হয়॥

ইহার পরের সূত্রটিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "মুক্তি ফলানিয়ম-স্তদবস্থাবধৃতে স্তদবস্থাবধৃতেঃ"——তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই জন্মান্তেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই॥

উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করেন এবং তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম ঘটে না। কিন্তু এই সূত্রটিতে

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য মুক্তিফল সম্পর্কেও এমন কোন নিয়ম নাই যে, দেহান্তেই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও কেন দেহান্তে মুক্তিলাভ হইবে না, এ আলোচনা বিচার্য ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। দেখা গেল যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও মুক্তিফল হইতে বঞ্চিত থাকেন, অবশ্য বিশেষ কারণে। বিশেষ কারণটি হইল কর্মবন্ধন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও যদি কর্মবন্ধন থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বদ্ধপুরুষের আচরণ যদি কেহ পরিদর্শন করিয়া থাকেনই, তবে কি তাহা আদৌ আশ্চর্যের বিষয় কিছু? ভগবান বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র তথা উপনিষদ হইতেই জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও কর্মক্ষয় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় বিদেহ মুক্তির পূর্বে। সেই কর্ম ভালোও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, কিম্বা শুভাশুভ মিশ্রিতও হইতে পারে।

এই কারণেই আমরা দ্বিধাহীন কন্ঠে এবং অকুন্ঠ চিত্তে ঘোষণা করিয়াছি— আচরণ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞকে জানা যায় না, আচরণে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন হানি ঘটে না। তাই তাঁহার আচরণের তথাকথিত ভালোমন্দ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে বেদান্তের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'পঞ্চদশী'তে যে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক এবং জিজ্ঞাসুগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর 'পঞ্চদশী'র রচয়িতা। বিদ্যারণ্যমুনিকে শংকরাচার্যের অবতার বা দ্বিতীয় শংকরাচার্য বলিয়া অদ্বৈতী-বেদান্তিগণ পূজা করিয়া থাকেন। 'পঞ্চদশী'কারও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রা, আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধেই বহু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন।

তাঁহার সিদ্ধান্তের সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের অভিমতের পূর্ণ সমর্থনই পাঠক দেখিতে পাইবেন।

(১) "যেমন দুইটি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি যথাক্রমে দুইটি ভাষাই ব্যবহার করেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।"

(২) "যেমন গঙ্গায় অর্ধমগ্ন পুরুষের যুগপৎ শীতোষ্ণ জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিবেকীর স্বরূপানন্দ ও সাংসারিক সুখদুঃখ যুগপৎ অনুভূত হয়।"

(৩) "যতদিন দেহ থাকে, ততদিন তত্ত্বজ্ঞের অবিদ্যা-বাসনাও থাকে, এই জন্য কখনো কখনো তত্ত্বজ্ঞও স্বপ্নে সাধারণ লোকের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করেন।"

(৪) "ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ ক্ষয় হইবার নহে। বামদেবের ইহা ক্ষয় হইতে এক জন্ম লাগিয়াছিল। বস্তুতঃ শেষ প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে কত জন্ম লাগিবে তাহার নিয়ম নাই।" ব্রহ্মসূত্রে ভগবান বেদব্যাসের সিদ্ধান্তেরই ইহা প্রতিধ্বনি যে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলপ্রাপ্তি যে এই দেহান্তেই ঘটিবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

(৫) "প্রারব্ধের বশে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কদাচিৎ অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে ; কারণ প্রারব্ধ কর্মকে কাহারও এড়াইবার ক্ষমতা নাই।"

(৬) "যাহার পূর্ণমাত্রায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতি প্রতিবন্ধ হয়, তাঁহার মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই ; তবে দুস্প্রারব্ধবশে জীবন্দশায় দুঃখ ভোগ হইতে নিষ্কৃতি হয় না, অর্থাৎ জীবন্মুক্তি সুখ ঘটে না।"

বেদান্তের দ্বিতীয় শঙ্করের সিদ্ধান্তসমূহ যে আমাদের পূর্বোক্ত অভিমত-সমূহের পূর্ণ সমর্থন করিতেছে, ইহা আর খুলিয়া বলার দরকার করে না। কাজেই আচরণ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ধরা যাইবে না এবং কোন আচরণেই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের ইতর বিশেষ সাধিত হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত।

জাগ্রত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চরিত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, শাস্ত্র বলেন। তাহা হইল—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতি অর্থাৎ শান্তি। প্রারব্ধের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরাগ্য কিম্বা উপরতির তারতম্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের কখনো আত্মবিস্মৃতি ঘটে না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার অব্যাহত ও স্থায়ী হইয়াই থাকে।

কাজেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যদি কেহ যথার্থই বৈরাগ্য বা উপরতির কম বেশী অভাব দেখিয়া থাকেন বা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানের তাহাতে কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তখনো রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তখনো রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

পঞ্চাশ পার হইলে 'বনং ব্রজেৎ' বিধান আছে। আর বন বলিতে ভারতের তপোবনকেই বুঝাইয়া থাকে। এযুগের ভারতের তপোবনের ঋষি বলিয়া যাঁহাকে জানিয়াছি এবং মানিয়াছি, পঞ্চাশ পার হইয়া বনে গমনের পরিবর্তে তাঁহারই পায়ে প্রণাম জানাইতেছি। 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' আমার সেই পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ, অর্থাৎ আমার ঋষি-প্রণাম।